বঙ্গবন্ধু চেয়ার

সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৪ই জুন, ১৯৪৭, রাজশাহী শহরে। তার পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলার হাজিরপাড়া গ্রামে। সেলিনা হোসেনের কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৭০ সালে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে। তিনি ১৯৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রিকাতে নিয়মিত উপসম্পাদকীয় লিখতেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি বাংলা একাডেমির 'অভিধান প্রকল্প', 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ প্রকল্প', 'বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলী প্রকাশ', 'লেখক অভিধান', 'চরিতাভিধান' এবং 'একশত এক সিরিজের' গ্রন্থগুলো প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, ২০ বছরেরও বেশি সময় 'ধান শালিকের দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালক হন। ২০০৪ সালের ১৪ জুন চাকুরি থেকে অবসর নেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ "উৎস থেকে নিরন্তর" প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। ভ্রমণ তাঁর নেশা। তাঁর মোট উপন্যাসের সংখ্যা ৪৩টি, গল্প গ্রন্থ ১৫টি এবং প্রবন্ধের গ্রন্থ ১৬টি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সেলিনা হোসেন ১৭.০৩.২০২১ হতে বিপিএটিসি'তে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুর উপর অনুষ্ঠিত ১২টি সিরিজ সেমিনার, গবেষণা কর্ম এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সফল বাস্তবায়নে তাঁর সক্রিয় ও নিরলস প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রকাশনা

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মজীবনের উপর

নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

সুদীর্ঘ ২৪ বছরের আন্দোলন এবং রক্তক্ষয়ী ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হচ্ছে এ বছর। এই বছরেই পালিত হচ্ছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী। এই জন্ম শতবার্ষিকী পালনে বাংলাদেশ লোক - প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) সিরিজ সেমিনার, গবেষণা কর্মসহ নানা রকম কর্মসূচি পালন করছে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বিপিএটিসির 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রের অনুষদবর্গের অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে সেলিনা হোসেন দশটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যার সংকলন করে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম এবং চিন্তা-চেতনা উপজীব্য করে প্রবন্ধসমূহ রচিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বহুমাত্রিক এই লেখাগুলো শুধু যে পাঠকদের জানার আগ্রহ পূরণ করবে তাই নয়, সেই সাথে ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে লেখা বা গবেষণার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে প্রভূত সাহায্য করবে বলে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি। এছাড়া সংকলনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে বিপিএটিসির একটি স্মারকগ্রন্থ হিসাবে যুক্ত হলো।

–মোঃ রকিব হোসেন, এনডিসি
রেক্টর

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের উপর

নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রকাশনা

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের উপর

নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা - ১৩৪৩

সম্পাদনা পর্ষদ

১। মোঃ রকিব হোসেন, এনডিসি, রেক্টর
২। মোঃ আতিকুজ্জামান, পরিচালক
৩। মোঃ শরীফ হাসান, পরিচালক
৪। ইফফাত জাহান, উপপরিচালক
৫। মোতাহার হোসেন, উপপরিচালক
৬। সামিয়ানা সুলতানা, মূল্যায়ন কর্মকর্তা

ব্যবস্থাপনায় :

- প্রশাসন অনুবিভাগ
- প্রকাশনা অধিশাখা
- মুজিববর্ষ সচিবালয়, বিপিএটিসি

গ্রন্থস্বত্ত :

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৬
বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও রাষ্ট্রের মৌলিকতা	১২
রাজনীতি-সংস্কৃতির যোগসূত্রে বঙ্গবন্ধু	২২
ছয় দফা : বাঙালির মুক্তিসনদ	৩২
সত্তরের নির্বাচন থেকে একাত্তরের অসহযোগ	৪৪
ভাষণের পূর্ণমাত্রায় বাঙালির বিজয়	৫৬
সামাজিক আদর্শ ও বঙ্গবন্ধু	৬৮
শিক্ষকের মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু	৭৮
নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা	৮৮
বঙ্গবন্ধুর বিশ্বযাত্রা	৯৮
বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তা	১০৪

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের এক অবিসংবাদিত নেতা। 'বঙ্গবন্ধু' শব্দ উচ্চারণে লাল-সবুজের পতাকাসহ ষোল কোটি মানুষের একটি মানচিত্র ভেসে উঠে আমাদের মন ও প্রাণের নিগূঢ় উৎসে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত হয়েছে কালজয়ী গান, দীর্ঘ কবিতা ও অসংখ্য প্রবন্ধ-যেখানে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর নেতৃত্বের মাধুর্যতা, জনসম্পৃক্ততা, জনকল্যাণে আত্মত্যাগ ও বাঙালি জাতির জন্য স্বাধীন মানচিত্র প্রতিষ্ঠার এক সুদীপ্ত অঙ্গীকার। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Born-Leader' অর্থাৎ 'জাত-নেতৃত্ব'-এ গুণ ও খেতাবের অধিকারী এ উপমহাদেশে একমাত্র বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কোনো নেতা অর্জন করতে পারেননি। নেতৃত্বের শ্রেণি-বিন্যাসে একজন নেতা একই সঙ্গে অনেক গুণের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনন্য। নেতৃত্বের গুলাবলীর অনেকগুলো উপাদান তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান ছিল;

Democratic, Charismatic, Transformational নেতৃত্বের গুনাবলী যুগপৎ প্রভাব লক্ষণীয়। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, গ্রেট ব্রিটেনের উইনস্টন চার্চিল, কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ন, মিসরের জামাল আব্দেল নাসের, আলজেরিয়ার বুমেদিন এমনকি ভারতের মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের গুনাবলী একমুখী বৈশিষ্ট্যে অলংকৃত। লেনিন, মাও-সে-তুং, হোচিমিন, চে-গুয়েভারা, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও ইয়াসির আরাফাতের আদর্শিক নেতৃত্ব ও একাগ্রতা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের রাজনৈতিক দর্শন ও সংগ্রামের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, তবে অনেক ক্ষেত্রে এতটা বর্ণাঢ্য নয়। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ৪৭ বছর পরে হলেও ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড ডক্যুমেন্টারি হেরিটেজ-এ অন্তর্ভূক্ত হয়ে শুধু ইতিহাসই তৈরী করেনি আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ এড্রেস'কে অতিক্রম করে গেছে। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের অহংকার। মাত্র ১৮ মিনিটের এই অলিখিত ভাষণের ছন্দময় সংগ্রামী উচ্চারণ প্রাণ উৎসারিত রাজনৈতিক দর্শনের বহিঃপ্রকাশ। বঙ্গবন্ধু এখানে শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বর্ণনা করে বাঙালি জাতিকে সংগ্রামী হয়ে এই বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসার আহবান জানান। জনযুদ্ধের প্রতিটি স্তরের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা দেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন এই ভাষণের শেষ বাক্যের মধ্য দিয়ে ইস্পাত কঠিন উচ্চারণে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছে-'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২. বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছিল দার্শনিক চিন্তার ক্রমাগত প্রতিফলন। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীর সান্নিধ্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে তবে মৌলিকত্বে প্রভাবিত করেনি। রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর বঙ্গবন্ধু একক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং শোষণ মুক্তির সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হন। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা উপস্থাপন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও বিজয় অর্জন, রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় সামরিক

জান্তাকে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান এবং সর্বোপরি ৭ মার্চ ১৯৭১-এর ভাষণ ও স্বাধীনতার ডাক-সবকিছুই তাঁর দার্শনিক চিন্তার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তর। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে ব্যক্তি জীবনে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি দীর্ঘ সময় কারাবাস করেছেন যা দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতার ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনো রাজনৈতিক নেতাই তার দর্শন জীবিতকালে বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি অথবা তাঁর উত্তরসূরিগণ তা বাস্তবায়ন করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য জেল-জুলুম-হুলিয়া উপেক্ষা করে এবং নির্যাতন সহ্য করে জনবান্ধব রাজনৈতিক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে গেছেন। ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ঘোষিত স্বাধীনতার বজ্র আওয়াজ ৯ মাস জনযুদ্ধে 'শেখ মুজিব' নাম গণমানুষের অন্তরে প্রবহমান ছিল। 'আমার নেতা শেখ মুজিব' ও 'জয় বাংলা' স্লোগানে মুক্তিযুদ্ধ ছিল দীপ্ত শপথে বলীয়ান যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর মহান বিজয়ে 'বাংলাদেশ' নামের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সূচনা করে। বাংলাদেশ মানে শেখ মুজিব; আর শেখ মুজিব মানেই সোনার বাংলা গড়ার দার্শনিক স্বপ্নদ্রষ্টা এক রাষ্ট্রনায়কের নাম । ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ টেলিগ্রামে স্বাধীনতার চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে হানাদার পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হয়েও বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে যুদ্ধ চলাকালীন জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা হয়েছিলেন সর্বক্ষণ। ঘনিষ্ঠ সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলামের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন সাড়ে সাত কোটি বাঙালি ও বিশ্ব জনগণকে মনে করিয়ে দিয়েছে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশ নামক দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান। পাকিস্তান কারাগারে বন্দিদশা থেকে (কিংবা তাকে হত্যা করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত না হয়েও) শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসে এ রকম ঘটনাও বিরল। তাই একজন রাজনৈতিক কর্মী থেকে পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন দার্শনিক, রাজনৈতিক অবিসংবাদিত নেতা ও জাতির পিতা। এই মহান নেতার নেতৃত্বে মুগ্ধ হয়ে ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাঁকে হিমালয় পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই বিশ্ব নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধুকে দেখার পর তাঁর চারিত্রিক

মোহনীয়তায় এতই মুগ্ধ হয়েছেন যে হিমালয় ছাড়া অন্য কোনো উপমা খুঁজে পাননি। এ থেকেই বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনায়কোচিত গুনাবলী প্রমাণিত হয়।

৩. ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার হতে মুক্ত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর প্রাণের জনগণের কাছে ফিরে আসার পর বঙ্গবন্ধুকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গতানুগতিক কোনো শপথ নিতে হয়নি। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সব ব্যাকরণ বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে যেন ছিল বিরল ব্যতিক্রম। তবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তিনি শপথ গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি স্বাধীন দেশের মাটি থেকে মিত্রবাহিনী ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠাতে সক্ষম হলেন, যা ছিল তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রনায়কোচিত বিচক্ষণতার প্রতিফলন। এ পর্যায়ে ৭ মার্চের সেই ভাষণের ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এই দর্শনের ‘স্বাধীনতা’ অর্জিত হলো ; বঙ্গবন্ধু শুরু করলেন দেশ গড়ার কাজ অর্থাৎ জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে তিনি সচেষ্ট হলেন। প্রথমেই শুরু করলেন দেশের সংবিধান প্রণয়নের কাজ; পর্যায়ক্রমে নির্বাচন কমিশন গঠন, কল-কারখানা রাষ্ট্রীয়করণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করার জন্য শুর করলেন সবুজ বিপ্লব।

এসবই ছিল তাঁর দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ। গণতন্ত্রের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে গুরুত্ব দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন এবং সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের জন্য জাতীয়করণ পদক্ষেপ বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা ও মানদন্ড প্রমাণ করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব-কারো সাথে বৈরিতা নয়’ এই মূলমন্ত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্ব দরবারে আজও প্রশংসিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনে দ্রুত সহায়তা লাভের জন্য শুরুতেই তিনি যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারতসহ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ সফর করেন। ইসলামী বিশ্বকে বাংলাদেশ ও তার জনগণের পক্ষে আনার জন্য ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে যোগদান

করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাঁর বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক সুলভ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ব-আস্থা অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। একদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা 'বাকশাল' গঠনে তৎকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি বাস্তবমুখী অবস্থান হিসেবে অনেক গবেষকই এখন বিচার করেন। 'বাকশাল' মূলত ছিল বহুদলীয় রাজনৈতিক কাঠামোর এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা বা সমাজতান্ত্রিক বলয়ের অন্তরালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক সংস্করণ। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শহীদ না হলে এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় সুফল লাভ করার সুযোগ ছিল এবং এই রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি সফল হলে বহু দেশে হয়তো এ ব্যবস্থার চর্চা শুরু হতো।

৪. স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শুরুতেই প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নেন। প্রথমত, বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। বঙ্গবন্ধুর সিভিল সার্ভিসের উন্নতি জন্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে Administrative and Services Reorganization Committee (ASRC) গঠন করেন এবং জনপ্রশাসনে ব্যাপক Reform আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনার জন্য ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সংস্কার করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের ক্ষমতায়নে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এই সঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনকে শক্তিশালীকরণ ও প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বল্প সময়ে এসব পদক্ষেপ পর্যালোচনা করলেই বঙ্গবন্ধুর সফল রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সার্বিক বিচারে বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীনতা লাভ, অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ডাকে ও নেতৃত্বে সবার অংশগ্রহণ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও নিরাপদ অবস্থানে আনয়নে বঙ্গবন্ধুকে সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্বের সকল সফল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দার্শনিকদের জীবনাদর্শ পর্যালোচনা এবং বঙ্গবন্ধু-চর্চা ও গবেষণায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একজন দার্শনিক, অবিসংবাদিত নেতা ও সফল

রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মর্যাদা দান সময়োচিত চিন্তার সু-ফসল।

৫. জাতির পিতার সংগ্রামী নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক জীবন এবং রাষ্ট্র দর্শনের নানাদিক নিয়ে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তার প্রশিক্ষণার্থীদের মুজিব চর্চার সুযোগ তৈরীতে নিবেদিত। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক বেগম সেলিনা হোসেনের ১০টি প্রবন্ধ কেন্দ্রের শুধু একাডেমিক দলিল হিসাবে থাকবে না বরং এ পুস্তক প্রকাশনার ফলে সকল প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ থেকে উপকৃত হবে। এ ছাড়া এ সংকলনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে বিপিএটিসি-র একটি স্মারক গ্রন্থ হিসেবে কেন্দ্রকে মহিমান্বিত করবে। এক্ষণে জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

মোঃ রকিব হোসেন, এনডিসি
সরকারের সচিব ও রেক্টর, বিপিএটিসি

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও রাষ্ট্রের মৌলিকতা

সেলিনা হোসেন

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেন। বাড়িতে প্রথমে না গিয়ে তিনি জনগণের কাছে আসেন। এখানেই বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের বিপুল পরিসর স্পষ্ট হয়। পরিবারের প্রিয়জনের কাছে যাওয়ার আগে গণমানুষের কাছে এলেন। তাঁরাও তাঁর প্রিয়জন। তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি 'সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।' সেদিন তাঁর ফেরার প্রতীক্ষায় ছিল দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তিনি বক্তৃতা মঞ্চে ওঠেন। শুরু হয় ভাষণ। একপর্যায়ে বলেন, 'আপনারা আরও জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার

ভাষা। জয় বাংলা।'

কবি সুফিয়া কামাল তাঁর 'আমার দেখা মুজিব' লেখায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন : 'মুজিবের ত্যাগের কোনো সীমা নেই। তাঁর নিষ্ঠার কোনো পরিসীমা নেই। দেশকে যে সে কতোখানি ভালোবাসতো তার পরিমাপ কোথাও নেই। মানুষের জন্যে মমত্ববোধ, আত্মার একটা টান তাঁর ছিল। আজকের দিনে তাঁর মতো একটি মানুষ সারা বিশ্বে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তি ছিল না। যেখানে সঙ্কট, যেখানে সংগ্রাম, যেখানে সংঘাত দেখেছে, সে এসে আগে দাঁড়িয়েছে। মরণকে ভয় করেনি। তাঁর পেছনে লক্ষ জনতা 'মুজিব ভাই' বলে লাফিয়ে পড়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছে।'

ড. নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর 'শেখ মুজিব- একটি সংগ্রাম একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব' লেখায় বলেছেন, 'দীর্ঘ চব্বিশ বছরের অবরুদ্ধ কণ্ঠকে মুক্তি দিয়ে আজ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে 'জয়তু মুজিব জয়তু মুজিব'। মুজিব, তোমারি হউক জয়। আজ সাত কোটি বাঙালির কণ্ঠে যে মাতৃমন্ত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই 'জয় বাংলা' মন্ত্রে তুমিই দীক্ষা দিয়েছিলে তোমার দেশবাসীকে, আকুল মন আজ সমস্ত বিশ্ববাসীকে ডেকে বলতে চাইছে, 'শোন শোন ওগো নতুন পৃথিবীর মানুষেরা শোন, বাংলার মাটিতে আজ সার্থকতা লাভ করেছে কবিকণ্ঠ উচ্চারিত সত্যবাণী, 'মানবের তরে মাটির পৃথিবী, দানবের তরে নয়।' মানুষ আজ জয়ী,

অসত্য আজ পরাজিত, পশু আজ ধূলি লুণ্ঠিত।'

নিজের জাতিসত্তা এবং গণমানুষের আইডেনটিটির প্রশ্নে এমনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনবোধ। বিশ্বের কোনো আধুনিক রাষ্ট্রই নিজের আপন পরিচয়ের বাইরে থাকতে পারে না। একমাত্র ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে নতজানু রাষ্ট্রই আত্মপরিচয়কে শৃঙ্খলিত করে রাখতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর জাতিসত্তার পরিচয়ে ছিলেন আপোষহীন। পাকিস্তান সরকারের নাকের ডগায় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান না বলে আমাদের ভূখন্ডকে পূর্ববাংলা বলুন। পূর্বপাকিস্তান বলতে হলে বাঙালির গণভোটের ব্যবস্থা করুন। তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন দেশটির নাম রাখা হলো বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা লাভের আগেই তিনি দেশের নাম ঠিক করেছিলেন। তিনি দেশজুড়ে প্রদান করা ভাষণে অনবরত বলেছেন গণমানুষের অধিকারের কথা। দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাস করার মৌলিক সত্য। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন : 'আমার মাথা কিনতে পারে, পৃথিবীতে এমন শক্তি কারুর নেই। চিরদুঃখিনী বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়তে গিয়ে আমাকেও হয়তো আলেন্দের ভাগ্য বরণ করতে হবে– মরতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল আর ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে। কিন্তু আমি নতি স্বীকার করবো না।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ জীবনে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে আশা করেছিলেন এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত দেশে এক পরিত্রাণকর্তার দেখা পাবেন, যিনি মানুষকে মানুষের চরম আশ্বাসের কথা শোনাবেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলো বলেন, সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের সঙ্গে আমরা বঙ্গবন্ধুর কথাই মনে করতে পারি। তিনি আমাদেরকে যেভাবে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, মানুষ হিসেবে মানুষকে যে আশ্বাসের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, এ দেশে এমন আর কে চেয়েছেন? দূরদর্শী রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতম আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সে সময়ের পূর্ববঙ্গ নামের ভূখন্ডে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাহসী বাঙালির অমিত বিক্রম যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশ। রচিত হয়েছিল একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি।

ইতিহাসে তিনিই অমর যিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন–ইতিহাস তাঁরই পক্ষে যিনি সময়ের বিচারে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন। এ সংজ্ঞায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। যিনি কঠিন স্বরে নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন সর্বকালের উপযোগী এবং সব দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি অমর পংক্তি ‘আর দাবায়ে রাখতে পারবা না’। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে এই কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের সামনে এই পংক্তি একটি মৌলিক দর্শন। কোনো দেশই পদানত হয়ে থাকার ন্যূনতম শর্ত গ্রহণ করে না। বিশ্ববাসীর সামনে এই পংক্তি উজ্জ্বল জ্যোতি ছড়িয়েছে। বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলো বঙ্গবন্ধুর এই পংক্তি উচ্চারণ করে নিজেদের অধিকারের মর্যাদার বোধ থেকে। বঙ্গবন্ধু জাতির সামনে এই অমোঘ পংক্তি উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে বাঙালির জীবনে এই ঘটনার আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি হবে না।

তিনিই বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষদের মধ্যে সেই মানুষ যিনি ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে নিজ মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে তিনিই সেই মানুষ যিনি বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালির এই বড় অর্জন তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। বক্তৃতার শুরুতে বলেছিলেন, ‘আজ এই মহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগিদার যে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’ তিনি আরো বলেছিলেন, ‘যে মহান আদর্শ জাতিসংঘ সনদে রক্ষিত আছে, আমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ সে আদর্শের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।’ এভাবে রাষ্ট্রের মর্যাদা, মানুষের মর্যাদা তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘আমার কেবিনের একটা জানালা ছিল ওয়ার্ডের দিকে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। ..... রাতে কেউ আসে না বলে কেউ কিছু বলত না। পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। গোয়েন্দা কর্মচারী একপাশে বসে ঝিমায়। বারান্দায় বসে আলাপ হল এবং আমি বললাম, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। ..... আবার ষড়যন্ত্র চলছে বাংলা ভাষার দাবিকে নস্যাৎ করার। এখন প্রতিবাদ না করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ উর্দুর পক্ষে প্রস্তাব পাস করে নেবে।

নাজিমুদ্দীন সাহেব উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথাই বলেন নাই, অনেক নতুন নতুন যুক্তিতর্ক দেখিয়েছেন। ..... সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেই রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কনভেনর করতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে।' আমি আরও বললাম, "আমিও আমার মুক্তির দাবি করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব।"

মাতৃভাষার মর্যাদাকে তিনি রাজনৈতিক অধিকার বলে বুঝেছিলেন। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে ধ্বংস হয় মাতৃভাষার গৌরব। আজ বিশ্বের দরবারে ভাষার জন্য প্রাণদানকারী দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। ইউনেস্কো ঘোষণা দিয়েছে এই দিবস পালন করার জন্য। আধুনিক রাষ্ট্র তার অর্জনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে দেখতে চায়। বাংলাদেশ সেই অর্জনে জয়ী হয়েছে। এই অর্জনের নেপথ্য ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণীয়।

'দুঃখী মানুষ' বঙ্গবন্ধুর জীবনে দুটি শব্দ মাত্র ছিল না। তিনি তাঁর কৈশোর-তারুণ্যের সূচনা থেকেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার নিয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্কুল থেকে ফেরার পথে দরিদ্র বৃদ্ধ মানুষটিকে শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিজের গায়ের চাদর দিয়েছিলেন। গরিব ছাত্র বন্ধুকে ছাতা দিয়েছিলেন। অভাবের সময় অসহায় মানুষদের বাবার ধানের গোলা থেকে ধান দিতেন। এ সবকিছুই তাঁর কোনো তাত্ত্বিক ধারণা থেকে পাওয়া বিষয় নয়। তাঁর সহজাত প্রবণতার মধ্যেই বিষয়টি ছিল। 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সেনাবাহিনী' প্রবন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেন : 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের প্রতিটি মানুষের অতি আপনজন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙালির জন্যই ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ। স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য তাঁর স্নেহ ও দায়িত্ব কিছু কম ছিল না।'

'কারাগারের রোজনামচা' বইয়ে লিখেছেন : 'আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম। জেলখানায় আমার জন্য কাজ করবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার সাথে এক পাক হবে না! আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখনও জমিদার তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ যখন সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও এই শোষণ

ভয়াবহ।' এভাবে তিনি খাওয়ার বিষয় থেকে তাত্ত্বিক ধারণায় ঢুকে পড়েন। এই অসাধারণ প্রজ্ঞা তাঁর চেতনাবোধের শাণিত দীপ্তি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনীতির সঙ্গীদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন তাঁর নিজের লেখা থেকে সে উদ্ধৃতি দিচ্ছি : '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।' এই কথাগুলো গভীর বিশ্বাস থেকে উচ্চারিত সত্য। সহকর্মীরা কাঁদতে শুরু করেন এটিও গভীর সত্য বঙ্গবন্ধুর জীবনে। এই দর্শন নিয়ে তাঁর রাজনীতির চর্চা চলেছে পঞ্চান্ন বছরের জীবন পর্যন্ত।

স্বাধীনতার পরে সরকারের দায়িত্ব নিয়ে তিনি দেশ পুনর্গঠনের নানামুখী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করতে শুরু করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের ভৌত কাঠামো ভেঙে পড়েছে, শরণার্থীরা ফিরে আসতে শুরু করেছে, স্বজন হারানো মানুষের কান্না থামেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে তিনি অস্ত্র জমা নিতে থাকেন। যুদ্ধের সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করার জন্য রাস্তাঘাট, সেতু, রেললাইন ইত্যাদি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্য কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করেন। পল্লী বিদ্যুৎ চালু করেন। শিল্পকারখানা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। নতুন দেশের যাত্রা শুরুর কাজটি তিনি সুচিন্তিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। ১৯৭২ সালের মধ্যে একটি সংবিধান প্রণীত হয়। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল এই সংবিধানের মূলনীতি।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন হয়ে দেশে এসেছিলেন। লন্ডনে সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পাকিস্তান কারাগারে আপনি যখন দেখলেন আপনার কবর খোঁড়া হচ্ছে তখন আপনার কার কথা মনে হয়েছিল? তিনি বলেছিলেন, দেশবাসীর কথা। দেশে এসে তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, 'ইয়াহিয়ার কারাগারে আমি মরতে প্রস্তুত ছিলাম। কারণ, আমি জানতাম আমার বাংলার মানুষ মুক্ত হবেই। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশকে স্বাধীনতার জন্য এত অল্প সময়ে এত প্রাণ বলি দিতে হয়নি। আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তাদের কাছে আমার

একটাই প্রার্থনা ছিল- তোমরা আমার মৃতদেহটি আমার সোনার বাংলায় পাঠিয়ে দিও।'

ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তাঁর জীবন দর্শনের একটি অন্যতম দিক। ছাত্র জীবন থেকে তিনি সাম্প্রদায়িতকার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। যে কোনো আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞায় এটি একটি মৌলিক শর্ত। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধলে তিনি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় রিলিফের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বিপন্ন মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভারতের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত। তিনি ১৯৪৩ সাল থেকে ইসলামিয়া কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর 'ষাট দশক' শিরোনামের বইয়ে তিনি দাঙ্গার সময়ের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন : 'ইসলামিয়ার ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমাণ পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তা আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ওরা বালিগঞ্জের কাছে অপেক্ষা করত আর সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজে নিয়ে যেত। আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দিতে যেত। এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেইসব মুসলমান ছাত্রদের, যাঁরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এইসব ছাত্রদের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান।'

১৯৬৪ সালের বাঙালি-বিহারি দাঙ্গার সময় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিলেন। নারায়ণগঞ্জে ভয়াবহ সহিংসতার মধ্যে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, 'এই দাঙ্গার সময় বঙ্গবন্ধু নিজে তাঁর পরিবারকে গাড়িতে করে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই বাড়িতে তিনি আরও হিন্দু পরিবারকে দেখেছেন।' দাঙ্গা-বিরোধী কমিটিতে থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' লিফলেট প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু। 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' লিফলেট প্রচার করার দায়ে তাঁকে পাকিস্তান প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অর্ডিনেন্স এবং পাকিস্তান দন্ডবিধি প্রয়োগ করে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

এভাবে সাহসের সঙ্গে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। মানবতার দর্শন তাঁর মর্মমূলে ছিল। যেজন্য তাঁর দুঃখী মানুষের চেতনায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের ধর্মই প্রধান ছিল। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পরে নির্যাতিত নারীদের তিনি 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল নারী পুনর্বাসন বোর্ড। নির্যাতিত নারীদের পরিচর্যা

এবং আবাসনের জন্য গঠিত হয়েছিল এ বোর্ড। যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই কঠিন সমস্যা তিনি অনাবিল চিত্তে মোকাবেলা করেছিলেন। চেষ্টা করেছেন মেয়েদের সামাজিক অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে।

অন্যদিকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় নারীদের মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়েছিল। সংবিধানের অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতার কথার উল্লেখ আছে :

‘২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।’

আজকের বাংলাদেশের স্বপ্ন সহিংসতা নয়, নারী-পুরুষের সমতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য।

কিশোর বয়স থেকেই তিনি মানুষের কথা ভেবেছেন। তাদের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখেছেন। সেই বঞ্চিত মানুষদের কথা মনে রেখেই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। এই লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গঠন করেন নতুন রাজনৈতিক সংগঠন ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’। এই সংগঠনের ছোট নাম হয় ‘বাকশাল’। এর জন্য আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। ‘বাকশাল’কে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে উল্লেখ করেন বঙ্গবন্ধু। ‘বাকশাল’-এর মূল লক্ষ্য ছিল চারটি : ক) গণমুখী প্রশাসন খ) গণমুখী বিচার ব্যবস্থা গ) বাধ্যতামূলক বহুমুখী গ্রাম সমবায় ঘ) শোষিতের গণতন্ত্র। তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের দারিদ্র্য বিমোচনে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর।’ সাধারণ মানুষের জীবনে সমতার জায়গা তৈরিতে তাঁর কত নিবিড় পর্যবেক্ষণ ছিল। এভাবে তিনি

নিজ দর্শনের আলোকে রাষ্ট্রের মৌলিকতায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁকে হারালাম।

মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে তিনি যে বিপুল কাজ করতে চেয়েছিলেন সেটি ছিল পর্বতসমান কাজ। তারপরও তিনি সব চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। দেশি-বিদেশি চক্রান্তের সামনে বঙ্গবন্ধু নির্ভীক ছিলেন। নিজের জীবনের জন্য ভীত ছিলেন না। বাঙালি জাতিকে অবিশ্বাস করার মতো মানসিক দীনতাও তাঁর ছিল না। তিনি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে পাপ মনে করতেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই অমর বাণীটিকে তিনি ধ্রুব সত্য মেনেছিলেন। সেজন্য নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ বাসভবন ছেড়ে সরকারি বাসভবনে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা ভাবেননি। তাহলে তো গণমানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। মানুষকে ভালোবাসার মূল্য দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে।

আধুনিক রাষ্ট্রের মৌল চিন্তায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী এবং আধুনিক মনের অধিকারী। তিনি কখনো পশ্চাৎপদ মনোভাব নিয়ে দেশ ও জাতির ব্যাখ্যা করেননি। তাঁর সামনের সবটুকু ছিল প্রসারিত। তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি ‘একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়ে আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।’

বঙ্গবন্ধুর ডায়রিতে একটি গান ছিল। তাঁর প্রিয় গান হিসাবে তিনি সেটি লিখে রেখেছিলেন।

Love isn’t love till you give it away
Love isn’t love till it’s free
The love in your heart
Wasn’t put there to stay
Oh love isn’t love till you give it away
You might think love is a treasure to keep
Feeling to cherish and hold
But love is a treasure for people to share

You keep it by letting it go

এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম দিক love is a treasure for people to share. এই অসাধারণ গাণের বানী তিনি নিজের দর্শনে অনুরণিত করেছেন। তাঁর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ এমন : '১. মানুষকে ভালোবাসলে মানুষও ভালোবাসে। যদি সামান্য ত্যাগ স্বীকার করেন তবে জনসাধারণ আপনার জন্য জীবন দিতেও পারে। ২. সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি। আমি সব হারাতে পারি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না। ৩. প্রধানমন্ত্রী হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো।'

গণমানুষকে এভাবে ভালোবাসার মধ্যে ধরে রাখা আধুনিক রাষ্ট্রের দিক নির্দেশনা তৈরি করার মহান ব্রত। মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন উন্নয়নের মৌলিক শর্ত।

তথ্যসূত্র :

১. ধন্য সেই পুরুষ (বেতার বাংলার সংকলন), বেতার প্রকাশনা দপ্তর, ঢাকা।

২. রবীন্দ্র রচনাবলী – ২৬তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৩. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ : সম্পাদক – মিজানুর রহমান মিজান, নভেল পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৮৯।

৪. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউনির্ভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৬১, মতিঝিল, ঢাকা, ২০১২।

৫. শেখ হাসিনা রচনাসমগ্র-১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০।

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত সংশোধিত)।

রাজনীতি-সংস্কৃতির যোগসূত্রে বঙ্গবন্ধু

সেলিনা হোসেন

কিশোর বয়স থেকেই সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির যোগসূত্র গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি সাংস্কৃতিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন কিশোর বয়স থেকে। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়াড় ছিলাম না, তবুও স্কুলের টিমের মধ্যে ভাল অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিল না।

আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম।'

তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন কিশোর বয়সে তিনি রাজনীতি নিয়ে ভাবেননি। অথচ জীবনের পরবর্তী ধাপে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে বিশাল পরিসর গড়ে তোলেন রাজনীতির মুক্তমঞ্চে। বাঙালির স্বপ্ন সাধনায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যুদ্ধে জীবনজয়ী হওয়ার জন্য। তাঁর একটি অসাধারণ উক্তি আছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে : 'একজন মানুষ

হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

যে ভালোবাসার শক্তি তিনি প্রবল আবেগে অর্থবহ উচ্চারণে সঞ্চারিত করেছেন, তা ব্যক্তি অনুভূতির ঊর্ধ্বে দেশ ও গণমানুষের প্রতি ভালোবাসাকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন।

মানুষকে ভালোবাসার সবটুকু ধারণ করে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। এই গান রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতির যোগসূত্র। সংস্কৃতি-রাজনীতির দিগবলয়ে একটি ব্যতিক্রমী শব্দ অসম্প্রদায়িকতা। বঙ্গবন্ধু কিশোর বয়স থেকেই এই শব্দ লালন করেছেন মানবিক বোধের গভীরতম সত্যে।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে তিনি কিশোর বয়সের আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন : '১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের

ছাত্র আমরা তখন। আগেই বলেছি আমার বয়স একটু বেশি, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়ল আমার উপর। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে। এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান- সবই চলত।'

১৯৪৯ সালের কথা বঙ্গবন্ধু লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। সে সময় তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানায় কৃষ্ণনগর স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন, সোহরাব হোসেন ও বেদারউদ্দিন আহম্মদ খান এসেছিলেন গান গাইতে। তিনি আব্বাসউদ্দিন সম্পর্কে লিখেছেন : 'তাঁর গান ছিল বাংলার জনগণের প্রাণের গান। বাংলার মাটির সাথে ছিল তাঁর নাড়ির সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয়, সরকারের প্রচার দপ্তরে তাঁর মত গুণী লোকের চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতে হয়েছিল।' একজন সঙ্গীতশিল্পী সরকারি চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করবে কেন? এ বিষয় তিনি পছন্দ করেননি। সংস্কৃতি চর্চার মর্যাদাকে তিনি ভিন্নভাবে দেখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন : 'পরের দিন নৌকায় আমরা রওয়ানা করলাম, আশুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন ধরতে। পথে পথে গান চলল। নদীতে বসে আব্বাসউদ্দিন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে। আমি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের একজন ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।" আমি কথা দিয়েছিলাম এবং কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলাম।'

কি সুন্দর করে তিনি বলেছেন আব্বাসউদ্দিনের গান না শুনলে জীবনের সংস্কৃতির সৌন্দর্যবোধ অপূর্ণ থাকত। কি সুন্দর করে বললেন, নদীর ঢেউও গান শুনছে। অসাধারণ অনুভূতির প্রকাশ হয়েছে এই দুই পংক্তিতে।

'ইত্তেফাক' পত্রিকায় আরও লেখা হয় : 'বন্দিদশা হইতে সদ্যমুক্ত আওয়ামী লীগ

প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের দাবি জানাইয়াছেন। গতকাল (রবিবার) রেসকোর্সের গণসংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর বর্তমান সরকারের হামলার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, জ্ঞান আহরণের পথে এই সরকার যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন তার নজির বিশ্বে বিরল। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে, আমরা মির্জা গালিব, সক্রেটিস, শেক্সপিয়ার, এরিস্টটল, দান্তে, লেনিন, মাওসেতুং পড়ি জ্ঞান আহরণের জন্য আর দেউলিয়া সরকার আমাদের পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের লেখা, যিনি একজন বাঙালি কবি এবং বাংলায় কবিতা লিখিয়া যিনি বিশ্বকবি হইয়াছেন। শেখ মুজিব দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমরা এই ব্যবস্থা মানি না- আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিবই এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত এই দেশে গীত হইবেই। শেখ মুজিব রেডিও এবং টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর হইতে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া অবিলম্বে রেডিও ও টেলিভিশন হইতে পর্যাপ্ত পরিমানে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচারের জোর দাবি জানান। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও গতকল্যকার গণসংবর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে অবিচল ও অবিরাম সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঢাকার ইতিহাসে সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমরা বক্তৃতা বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নানা বিশ্লেষণে বিশেষিত করার প্রয়াস পাই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হইয়া উঠে তাহা হইতেছে তিনি মানব দরদী –– বিশেষ করিয়া বাংলা ও বাঙালির দরদী, প্রকৃত বন্ধু। তাই, আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের পক্ষ হইতে আমরা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করিতে চাই। রেসকোর্সের জনতার মহাসমুদ্র তখন একবাক্যে বিপুল করতালির মধ্য দিয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।' (ইত্তেফাক, সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।)

এর একমাস পরই, ২৫ মার্চ, আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন। তিনি সামরিক শাসন জারি করে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করেন। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ৬-দফা ও ১১-দফা বাস্তবায়ন।

একই বছরের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা। আওয়ামী লীগ আয়োজিত সভায় শেষ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ' রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। .... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। .... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি- আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

রাষ্ট্রের নামের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বোধের দৃঢ়তাও তিনি গভীর আবেগে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর রাজনীতির পুরোটা জুড়ে তিনি সংস্কৃতির চেতনাকে সংযুক্ত রেখেছেন। কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন করেননি। রাজনীতি-সংস্কৃতির একই মাত্রায় তিনি তাঁর জীবনবোধ পূর্ণ রেখেছেন। একজন রাজনৈতিক নেতার এ এক অসাধারণ দিক।

১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স মাঠে ছাত্রলীগের তেইশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় নানা বিষয় উঠিয়ে এনেছেন। বলেছেন : 'বিশ্বে জাতি হিসাবে আত্মপরিচয় দানের জন্যই নতুনভাবে বাঙালির ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।' বলেছেন : 'বীর বাঙালি সন্তান সূর্যসেনের নেতৃত্বে যাঁহারা প্রাণদান করিয়াছেন, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক জালালাবাদ পাহাড়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতির মিনার নির্মিত হইবে।'

ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন : 'কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের কথা চিন্তা করাও পাপ। অথচ এদেশে রবীন্দ্রনাথকে অপাংক্তেয় ও নজরুল সাহিত্যকে 'মুসলমানী' করার নামে বিকৃতি করার চেষ্টা হইয়াছে। আমাদের বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এ ঐতিহ্যের ওপর বারবার আঘাত আসিয়াছে।'

২৫ জানুয়ারি 'দৈনিক আজাদ'-এর প্রতিবেদন ছিল এমন : '১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে সঙ্গীত শিল্পী সমাজ শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সংবর্ধনার আয়োজন করে। শিল্পীদের পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদান করেন রবীন্দ্র সঙ্গীতশিল্পী আবদুল আহাদ। তিনি শেখ মুজিবকে 'বঙ্গ সংস্কৃতির অগ্রদূত' বলে নন্দিত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিভিন্ন প্রসঙ্গ

নিয়ে আসেন। বলেন : 'দেশের গণমুখী সংস্কৃতিকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য-সংগীতে, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখকে প্রতিফলিত করতে হবে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই, মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি। আপনারা ভালোবাসা এবং শান্তির অনেক গান গেয়েছেন। আজ বস্তির নিঃস্ব সর্বহারা মানুষের জন্য গান রচনার দিন এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মতো বিপ্লবী গান গাইতে হবে। মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে হবে। যদি এতে বাধা আসে, সেই বাধা মুক্তির জন্য ৭ কোটি বাঙালি এগিয়ে আসবে।'

আরও বলেন : 'জনগণ যখন অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করছিল, তখন এক শ্রেণির শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি গত ২৩ বছরে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রশস্তি গেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা কি আজ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন? কোন ৪০ জন ব্যক্তি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছিলেন? কোন বিশেষ মহল তথাকথিত ইসলামের নামে নজরুলের গান ও কবিতার শব্দ বদলেছে? রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্বটা থাকে কোথায়?'

বঙ্গবন্ধুর বই পড়ার বিষয়টিও জানা যায় 'কারাগারের রোজনামচা' বই থেকে। জেলের অবসর সময় কাটিয়েছেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য পড়ে। ফরাসি সাহিত্যিক এমিল জোলার 'তেরেসা র‍্যেকুইন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৭ সালে। একশ বছর পরে বঙ্গবন্ধু এই বইটি পড়েন ১৯৬৬ সালে জেলখানায় বসে। লিখেছেন, 'এমিল জোলা-র লেখা 'তেরেসা রেকুইন' পড়ছিলাম। সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনটা চরিত্র - জোলা তাঁর লেখার ভিতর দিয়া। এই বইয়ের ভিতর কাটাইয়া দিলাম দুই তিন ঘন্টা সময়।'

তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কথাও উল্লেখ করেছেন এভাবে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে। রাশিয়ার প্রতিনিধিদেরও আমরা দাওয়াত করেছিলাম। এখানে রুশ লেখক অ্যাসিমভের সাথে আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সম্মেলনেই আমি মোলাকাত করি তুরস্কের বিখ্যাত কবি নাজিম হিকমতের সাথে। বহুদিন দেশের জেলে ছিলেন। এখন তিনি দেশত্যাগ করে রাশিয়ায় আছেন। তাঁর একমাত্র দোষ তিনি কমিউনিস্ট। দেশে তাঁর স্থান নাই, যদিও বিশ্ববিখ্যাত কবি তিনি।' এর পাশাপাশি তিন জেলখানায় বাংলা বই ও পত্রিকা না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। 'কারাগারের রোজনামচা'য় আছে 'প্রাণটা আমার

হাঁপাইয়া উঠছিল, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। বাংলা বই পাওয়ার উপায় নাই। অফিসার মেসের যে ছোট লাইব্রেরি আছে তাতে কোনো বাংলা বই নাই, সমস্তই প্রায় ইংরেজি ও উর্দুতে। হেডকোয়ার্টার লাইব্রেরি থেকে মেজর গোলাম হোসেন চৌধুরী আমাকে দু' একখানা এনে দিতেন। ভদ্রলোকও খুব লেখাপড়া করতেন। কোনো বাংলা বই বোধ হয় সেখানে নাই। খবরের কাগজ পড়া নিষেধ, তাই বাংলা কাগজ পড়ার প্রশ্ন আসে না।'

এতে প্রমাণিত হয় জ্ঞানের জিজ্ঞাসায় তিনি নিজেকে পূর্ণ করেছেন রাজনীতি-সংস্কৃতির জগত ধারণ করে।

১৯৭১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা একাডেমিতে সাত দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর 'ভাষা ও ভাষাবোধ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন : 'আমি স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, বিশেষ এ কারণে যে, উনিশশ' একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে এই বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তিনি এসেছিলেন। তাঁর ঠিক পেছনেই আমি বসেছিলাম, আর যখন অনুষ্ঠান চলছিল ঠিক তখনই কেউ একজন, তাঁকে ঠিক মনে নেই, তাঁরই কোনো এক সহকর্মী, বঙ্গবন্ধুর কানে কী একটা সংবাদ জরুরী ও উত্তেজিত কণ্ঠে জানালেন।

স্পষ্ট মনে পড়ে আজও, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মুখ ক্রুদ্ধ এবং দৃপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরেই জেনে যাই, জুলফিকার আলি ভুট্টোর সংসদ বর্জন করবার সিদ্ধান্তটি তাঁকে জানানো হয়। অনুষ্ঠানে গানের জন্য উপস্থিত ছিলেন এখন প্রয়াত গায়ক হুসনা বানু খানম। বঙ্গবন্ধু তাঁকে তাৎক্ষণিক ফরমাশ করেন রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি গাইবার জন্য – 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/ তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'। এ তো শুধু গান নয়, বাংলা ভাষায় লেখা বলে নয়, এর অন্তর-ধাবনটি বাঙালির জন্যেও বিশেষ সেই ক্ষণটিতে-আরো প্রবল, ভাষার শরীরে প্রোথিত ইতিহাস সংস্কার নিয়েই এর উচ্চারণ। অন্যভাষায় অনুবাদ করলে বিভাষীর কাছে এ গানের অর্থটিই কেবল পরিষ্কার হয়ত হবে, কিন্তু বাঙালির জন্যে এর ব্যঞ্জনা ও অভিভাবের তিলমাত্র নয়। বঙ্গবন্ধু যে সে মুহূর্তে এই গানটিরই ফরমাশ করেন এই প্রমাণেই আমার বিশ্বাস, সেদিন এই বাংলা একাডেমির চত্বরেই বঙ্গবন্ধুর জানা হয়ে যায়, আমাদের স্বাধীনতা অতি আসন্ন। বঙ্গজননীকে এবার রণদৃপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে হবে।"

সাংস্কৃতিক বোধের এটি একটি দিক। পাশাপাশি তাঁর মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার

বিষয়টি ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক দিকের বড় পরিসর। মাতৃভাষার মর্যাদা ছাড়া মানুষ তার জাতিসত্তার শেকড় হারায়। নামমাত্র বেঁচে থাকা মর্যাদার আসন শূন্য করে রাখে। বঙ্গবন্ধু এই চেতনা ধারণ করেছিলেন তাঁর দেশবাসীর সঙ্গে। তাঁর সামনে শিল্পী আব্বাসউদ্দিন শুধু একজন গায়ক নন, তিনি সংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার কথা বলেন। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায় যে, বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমির একটি অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, '১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার ছিল না, বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল।"

কত সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞায় তিনি বিষয়টিকে তার মধ্যে ধারণ করেছিলেন। রাজনীতির জায়গাটি তিনি সামগ্রিক চেতনায় প্রসারিত করে ধারণ করেছিলেন। এটি তাঁর জীবনদর্শনের মৌলিক জায়গা। মানুষের আবেগে-চিন্তায় দেশপ্রেমের অনুরণন ঘটিয়ে তিনি অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের কথা বলতেন।

১৯৭৩ সালের ৩রা মে তিনি তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন : As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bangalee, I am deeply involved in all that concerns Bangalees. This involvement is born and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my very being. Sheikh Mujibur Rahman, 3.5.73

"১৯২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারায়ণগঞ্জের ছাত্রসংঘ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন : 'এখানকার ভূমি যেমন উর্বর, মানুষের চিত্তশক্তিও তেমনি উর্বর। যে-কোনো মহৎ কর্মকে সফল করে তোলবার মতো চিত্তশক্তি এখানকার লোকের আছে।'

পূর্ববঙ্গ নিয়ে আশাবাদী রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শী চিন্তা ফিরে ফিরে এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দেশের অগণিত সাধারণ মানুষ, যাঁরা শক্তি-সাহসের দেশপ্রেম দিয়ে জাতিগত সাফল্য সম্ভব করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালের ৪ নভেম্বর গুয়াহাটি থেকে সিলেটে আসেন। সিলেট ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি, আনজুমানে ইসলামিয়া প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রনে। নভেম্বরের ৬ তারিখে শ্রীহট্ট মহিলা সমিতি তাঁকে সংবর্ধনা দেয়। সন্ধ্যায় টাউন হলে তিনি জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় উল্লেখ করেন, 'নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি উচ্চবর্ণের অবজ্ঞা ও অপ্রীতিই ভারতবর্ষের

অধঃপতনের কারণ। ভারতবর্ষের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে একতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া। সূর্য পূর্বদিকেই উদিত হয়, বাংলাদেশ ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত, সমগ্র ভারতবর্ষ তাই আজ বাংলার দিকে আশা করে চেয়ে আছে। কাগজের নৌকাতে ভর করে ভবসমুদ্র পার হওয়া যায় না। মানে দরখাস্ত করে স্বরাজ মেলে না।'

কবি বলেছিলেন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। আর বাংলাদেশ ভারতের পূর্বদিকে। যে প্রত্যাশার কথা সেদিন তিনি বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর উচ্চারণে অবধারিত সত্য হয়ে ওঠে। দরখাস্ত করে স্বাধীনতা পাওয়ার কথা ভাবেননি দেশবাসী। সরাসরি যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্য উঠিয়েছেন। সূর্য রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত বাংলাদেশে উঠেছে শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রজ্ঞায়।

বঙ্গবন্ধু নিজের জবানীতে বলেছেন, “আমার মাথা কিনতে পারে পৃথিবীর এমন শক্তি কারো নেই। চিরদুঃখিনী বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে, শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সোনার বাংলা গড়তে গিয়ে আমাকেও হয়তো আলেন্দের ভাগ্য বরণ করতে হবে – মরতে হবে প্রতিক্রিয়াশীল আর ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে। কিন্তু আমি নতি স্বীকার করবো না।”

একই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে ধ্বণিত হয় কতিপয় অমর পংক্তি : –

“উদয়ের পথে শুনি কার বাণী

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই

নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।”

এভাবেই তিনি বাঙালির সামগ্রিক বোধকে নিজের রাজনৈতিক চিন্তায় স্থাপন করেছেন। সেই লক্ষ্যে কর্মকান্ড পরিচালনা করেছেন। লক্ষ্য অর্জনের মাত্রাটিকে স্থিরভাবে অনড় রেখেছেন। এর দ্বারা বাঙালি- বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচিতি ঘটেছে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ দিবসকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করেছে UNESCO. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহ্যিক প্রামানিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে UNESCO. ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছেন। নিজ মাতৃভাষাকে তুলে ধরেছেন বিশ্বের দরবারে। এভাবে সংস্কৃতি-রাজনীতির যোগসূত্রে বাঙালি-বাংলাদেশকে অনন্য গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সচেতন বোধে।

ছয় দফা : বাঙালির মুক্তিসনদ

সেলিনা হোসেন

১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কৈশোর থেকে সূচিত রাজনৈতিক জ্ঞানের ধারাবাহিকতায় তৈরি করেছিলেন বাঙালির অধিকার সচেতনতার মূল সূত্র ৬ দফা কর্মসূচি। তিনি এই রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞকে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচি' শিরোনামে পাকিস্তানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছয় দফা বাঙালি জাতির অধিকার অর্জনের সচেতন পদক্ষেপ। কিশোর বয়স থেকে বঙ্গবন্ধু মাটি-মানুষ বিষয়ে জ্ঞানের যে প্রজ্জ্বলনে নিজেকে দীপ্ত করেছিলেন সেই সাধনায় বাঙালির মুক্তিসনদ তৈরি হয়েছে ছয় দফার দীপ্ত আলোতে – তিনি ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে এগিয়েছেন রাজনীতির শক্ত পাটাতনে। তিনি দেখেছেন কীভাবে শোষণ করা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানকে। দেখেছেন বাংলার সোনালি আঁশ পাট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। আর সেই টাকা দিয়ে উন্নয়ন করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করার আরও নানাদিক তিনি গভীর পর্যবেক্ষণে করায়ত্ত করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৫ জুন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান

গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের সেশন চলছিল। গণপরিষদের সদস্য বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছেন : 'Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal.' We have demanded so many times that you should use Bengal instead of East Pakistan. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own.'

এই কথা বলে তিনি পূর্ববঙ্গের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানতে পারেননি। গণমানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: 'You can change only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back in Bengal and ask them whether they accept it.' ভূখণ্ডের নামের অধিকার আদায়ের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন অমিত সাহসে।

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭ দিন যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ চলার সময় পূর্ব পাকিস্তানকে একদম অরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রের এমন অবস্থা ছিল না যে ভারতের আক্রমণের মোকাবেলা করতে পারত। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছিলেন এভাবে যে, 'চীনের ভয়ে ভারত পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধে জড়াতে সাহস করেনি।' এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে ১৭ দিন

যুদ্ধকালীন সময়ে এতিমের মতো ফেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত লেফট রাইট করে হেঁটে যেত তবুও তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ব বাংলার ছিল না। আর চীনই যদি আমাদের রক্ষাকর্তা হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে চীনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেই হয়।' বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে প্রবলভাবে মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য ৬ দফা দাবী প্রণয়ন করেন।

১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে ক্ষমতাসীন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর দমন নীতিমূলক একতরফা সরকার পরিচালনা পদ্ধতি দেখতে দেখতে বঙ্গবন্ধু নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। বঞ্চনা ও শোষণের যাঁতাকলে পূর্ববঙ্গবাসীর বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক পথচলার ধারা অনবরত বেগবান করেছেন। রাজনীতি বোঝার বোধের তীক্ষ্ণতায় সমসাময়িক সময়ে অন্যদের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর দুজন প্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানি শাসকেরা যেভাবে নানা কৌশলে অপদস্ত করেছে সেটিও ছিল তাঁর বোঝার শিক্ষা। পিছু হটার চিন্তা তিনি কখনো করেননি। এগিয়ে যাওয়ার মননশীল দৃঢ়তা তাঁর চেতনার প্রদীপ্ত শিখা। তিনি বাঙালির স্বদেশ চেতনা উপেক্ষা করে শাসকগোষ্ঠীর হাতে নিপীড়নের ভয়ে ভীত ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধু বাঙালির বাঁচার দাবি ৬ দফা প্রণয়ন করেন। এর মূল দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু দফা দাবিকে বাঙালির মুক্তি সনদ হিসেবে তুলে ধরেন। ছয় দফার প্রতিটি দফায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিভিন্ন দিক ----

"১নং দফায় বলা হয়েছে, "ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশন রূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্ত-বয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।...." পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার এটি একটি দিক।

২নং দফায় বলা হয়েছে, "ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।...." পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর অধিকারের ব্যাপারে এটি এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

৩নং দফায় বলা হয়েছে, "এই দফায় আমি মুদ্রা সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজেই বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় এ মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।...." এই দফাও প্রদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে দৃঢ় করার জন্য।

৪নং দফায় বলা আছে, "সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।...."

৫নং দফায় বলা আছে, "এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১। দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২। পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি রফতানি চলিবে।

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন

> স্থাপনের এবং আমদানি-রফতানি করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।...."

৬নং দফায় বলা আছে, "এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এ দাবি অন্যায়ও নয়, নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এ অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বারো বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচানো হইবে ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষাব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতেরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদেরকে তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। নৌ-বাহিনী অস্ত্র কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধাসামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের এত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা তহবিলে নিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না। এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরীবি হালে আত্মরক্ষা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা? ...."

বঙ্গবন্ধু এভাবে পাকিস্তান সরকারের সামনে বাঙালির অধিকার আদায়ের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলোর অধিকারের কথাও

বলেছিলেন। ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদের 'গ' ধারায় বলা হয়েছিল : 'প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত।' কিন্তু পাকিস্তানের জন্মের পরে এই বিষয়টিকে প্রবলভাবে উপেক্ষা করেছে শাসক গোষ্ঠী। তারা পুরো ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে কুক্ষিগত রাখে। প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করে। তথাকথিত ইসলামী সংস্কৃতি চালু রাখার জন্য বাঙালির বাংলা ভাষাকে পর্যন্ত উপেক্ষা করে। ফলে ইতিহাসের নির্মম পরিণতি তার নিয়তির লিখন হয়েছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর 'বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা' প্রবন্ধে লিখেছেন : "১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সে যুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ বা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এ অঞ্চলের সুরক্ষার কোনো গুরুত্বই ছিল না। ভারতের দয়ার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পূর্ব বাংলাকে। ভারত সে সময় যদি পূর্ববঙ্গে ব্যাপক আক্রমণ চালাত, তাহলে ১২শ' মাইল দূর থেকে পাকিস্তান কোনোভাবেই এ অঞ্চলকে রক্ষা করতে পারত না। অপরদিকে তখনকার যুদ্ধের চিত্র যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা দেখি পাকিস্তানের লাহোর পর্যন্ত ভারত দখল করে নিত, যদি না বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকেরা সাহসের সঙ্গে ভারতের সামরিক আক্রমণের মোকাবিলা করত। .... পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান যে কোনো উপায়ে এই আন্দোলন দমন করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে। কিন্তু তাদের শত নির্যাতন উপেক্ষা করে বাংলাদেশের মানুষ ৭ জুনের হরতাল পালন করে ৬ দফার প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়ে দেন। পাকিস্তান সরকার উপযুক্ত জবাব পায়। দুঃখের বিষয় হলো, বিনা উস্কানিতে জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। এতে শ্রমিক নেতা মনু মিয়াসহ ১১ জন নিহত হন। আন্দোলন দমন করতে নির্যাতনের মাত্রা যত বাড়তে থাকে, সাধারণ মানুষ তত বেশি আন্দোলনে শামিল হতে থাকেন।

৭ জুন হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন : '১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে হরতাল হয়েছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছেন। তাঁরা ৬ দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়। বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা চায়; শ্রমিকের ন্যায্য দাবি, কৃষকদের বাঁচার দাবি তাঁরা চায়, এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল' (কারাগারের রোজনামচা পৃ. ৬৯)।"

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে আইয়ুব খানের বিরোধী

দলগুলো একটি বৈঠকে বসে। বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি সভার বিষয়সূচিতে সংযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন। সভার সভাপতি ছিলেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী। তিনি সভায় ছয় দফা দাবির পুরো আলোচনা করতে সম্মতি দেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক নেতারা ছয় দফাকে সমর্থন করেননি। তারা ছয় দফাকে পাকিস্তান ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখে এবং এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোও বঞ্চিত শোষিত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতটি উপেক্ষা করে তারা প্রবল বিরোধিতা করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোও ছয় দফার বিরুদ্ধাচারণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলও বিরোধিতা করে। পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় ৬ দফার গুরুত্ব অস্বীকার করে। তার দুটি নমুনা এমন ----

দফায় দফায় (দৈনিক পাকিস্তান, ২৮ মার্চ ১৯৬৬)

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির রঙিন ফানুস উড়াইয়া যাহারা জনসাধারণের ঐক্যকে নষ্ট করিতে চাহিতেছেন, তাহারা যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে কাজ করিতেছেন না, তা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। এ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার লক্ষ্য। রাজনৈতিক কলহ-কোলাহলে অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে ক্ষয় করিয়া দিয়া দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে যাহারা বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে, জনসাধারণ তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে। এ দেশের মানুষ আর দফায় দফায় প্রবঞ্চিত হইতে চাহে না।

ছয় দফার নামে (পয়গাম ৩১ মার্চ ১৯৬৬)

বিরোধী দলগুলির বিচিত্র ভিন্ন ভিন্ন যুক্ত এবং বিযুক্ত বহু দফার রাজনীতির স্বরূপ জনগণ ভালো করিয়াই এত দিনে ধরিয়া ফেলিয়োছে। ১৯৫৪ হইতে তাঁরা বারবার এসব চাল দফায় দফায় দিয়া আসিতেছেন। ১৯৫৪ হইতে ১৯৬৬ সনের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। জনগণ তাদের স্বার্থের শত্রু-মিত্রকে এই সময়ের মধ্য ভালোভাবেই চিনিয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং ছয় দফা হোক আর যে কোনো দফাই হোক, আর কোনো ভাঁওতায়ই তারা এবার ভুল করিবে না, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।”

ইত্তেফাক পত্রিকা চমৎকারভাবে পক্ষে লেখে :

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মার্চ ১৯৬৬)

যখনই এ অঞ্চলের মানুষ অন্যায়-আসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন,

তখনই তাদের দেওয়া হয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদের, আঞ্চলিকতাবাদের, সংহতি বিনষ্টের অপবাদ। ... জননেতাদের শত্রুর চর আখ্যায়িত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবকালে মরহুম শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হককে শেষ বয়সে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়েছে। সর্বজনমান্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কারারুদ্ধ ও দেশ হতে বহিষ্কার করা হয়েছে। তরুণ বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিবসহ এতদঞ্চলের প্রায় তিন হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমরা চাই কেন?

এর একমাত্র এবং সহজ ও সোজা উত্তর হচ্ছে পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য। কারণ, সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে মুখে রক্ত সঞ্চালনের নাম যেমন স্বাস্থ্য নয়, তেমনি বৃহত্তর জনসমাজকে সর্বনাশের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়ে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এবং সকল মানুষকে অধিকার বঞ্চিত রেখে এক স্থানে এবং সমস্ত শক্তি এক হাতে ধারণের অনুকূলে যুক্তি প্রদর্শন করছেন।”

১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। ঢাকা বিমানবন্দরে নামার পরে সাংবাদিকদের ছয় দফার ব্যাখ্যা দেন। এই দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ বলে উল্লেখ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে ছয় দফা দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গৃহীত হয়। এরপরে তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় জনসমাবেশ করেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ মানুষ সমবেত হয়ে ছয় দফার কথা শোনেন।

তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা করেন তার শুরুটা এমন :

‘আমার প্রিয় দেশবাসী ভাই-বোনেরা,

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমি স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়াই উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের

দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি শোষিত-বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি- তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে।”

তিনি শেষ করেছেন এভাবে -‘আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তিতর্ক সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশি শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমি স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মতো মুরুব্বিরাই এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এরা দেশদ্রোহী বলিয়াছেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা, পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সেসব সহ্য করিবার মতো মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালোবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছুই আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁহার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত

করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকি জীবনটুকু আমি যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি-সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

আপনাদের স্নেহধন্য খাদেম
শেখ মুজিবুর রহমান
৪ চৈত্র ১৩৭২”

বঙ্গবন্ধু ৬-দফা দাবির পক্ষে নিজের অবস্থান দৃঢ় করলেন। ৬-দফায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য আধা-সামরিক বাহিনী থাকবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র তৈরির কারখানা থাকবে। সামরিক একাডেমি এবং নৌবাহিনীর সদর দফতর থাকতে হবে। পূর্ববঙ্গের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে ৬-দফার এই বাঁচার দাবি ছিল অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা। সরকারের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর জনসভায় শিল্পীরা প্রাণের আকুতি মিশিয়ে গাইলেন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’, আর জনসভার হাজার হাজার মানুষ মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উপরে তুলে সমর্থন জানাল। শুরু হলো ৬-দফার জয়যাত্রা।

সরকারের হুমকি দমাতে পারেনি বাঙালিকে। ৬-দফা মানুষের প্রাণের দাবি হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি দেখে সামরিক শাসক আইয়ুব খান হুমকি দিলেন এভাবে ‘প্রয়োজন হলে অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেয়া হবে।’ বঙ্গবন্ধু কঠিন স্বরে বললেন, ‘কোনো হুমকিই জনসাধারণকে ৬-দফা দাবি আদায় আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।”

শুরু হলো ধরপাকড়। নির্যাতন। জেলজুলুম। সেটি ছিল গণজাগরণের বিস্ফোরিত সময়। বাঙালি রাস্তায় নেমেছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিল লক্ষ্য অর্জন ছাড়া ঘরে ফিরবে না। বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতেন : “সংগ্রাম করিয়া আমি আবার কারাগারে যাইব, কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালোবাসার ডালি মাথায় নিয়া দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না। মুহুর্মুহু করতালি ও গগনভেদী জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, বঞ্চিত বাঙালি, সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পাঠান আর বেলুচের মধ্যে কোন তফাৎ নাই- কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ হইতে দেশের উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হইল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদী।”

৭ জুন দেশব্যাপী ছয় দফার দাবিতে হরতার পালনের আহ্বান জানানো হয়।

রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমদ '৭ জুন একটি ভাস্বর দিন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন : "আমার স্মৃতিপটে এখনো ভাস্বর হয়ে আছে দিনটি। .... সেদিনের হরতাল কর্মসূচিতে ধর্মঘটি ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী নির্বিচার গুলিবর্ষণ করে। ফলে তেজগাঁওয়ে শ্রমিক মনু মিয়া, মুজিবুল্লাহসহ ১১ জন শহীদ হন এবং প্রায় ৮০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে হরতাল সফল করার দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রনেতা খালেদ মোহাম্মদ আলী ও নূরে আলম সিদ্দিকী। তাঁরা সেখানে বক্তৃতা করেন। প্রকতপক্ষে ৭ জুন ছিল স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার পথে আরম্ভস্থল তথা যাত্রাবিন্দু।... ছয় দফার পক্ষে ৭ জুনের হরতাল এতটাই সর্বব্যাপী ছিল যে এ সম্পর্কে কোনো রকম প্রতিবেদন মুদ্রণ ও প্রকাশের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। বিধিনিষেধ সত্ত্বেও মানিক মিয়া তাঁর কলামে লেখেন, ছয় দফা আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য গৃহীত নিষ্ঠুর ব্যবস্থাদির কারণে মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হলো এই যে জনসাধারণ ছয় দফা আন্দোলন তথা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনেকে তাদের নিজেদের আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেছে। ৭ জুনের সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচি ও ছয় দফার পক্ষে জনমত তৈরিতে ইত্তেফাক-এর ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধির ৩২(১) ধারার আওতায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার এবং দ্য নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করে।.... ৭ জুন যে সার্বভৌম পার্লামেন্টের দাবিতে আমরা ছয় দফার পক্ষে সংগ্রাম করেছিলাম, সেই কর্মসূচির ফলই হচ্ছে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ। ৭ জুন ছিল এর সূচনাবিন্দু।"

১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করার পরে দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১)'ক' নম্বর ধারায় বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান সাংবাদিকদের বলতেন, 'আমি যতদিন গভর্নর, শেখ মুজিবকে জেলেই থাকতে হবে।'

৬ দফা কর্মসূচি বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। জনগণ মিছিলে গণআন্দোলনের সাহসে উজ্জীবিত হয়। প্রায় আটশত লোককে গ্রেফতার করে মোনায়েম খান। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং ৬ দফার সমর্থনে হরতাল পালন শুরু হয়। ছাত্রজনতা ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে ১৪৪ ধারা জারী করে গভর্নর। স্লোগান ওঠে 'জেলের তালা ভাঙবো শেখ মুজিবকে আনব।'

এই সময় বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে ৩৪ জনের বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র

মামলা জারী করা হয়।' প্রবল প্রতিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ববঙ্গবাসী।

আওয়ামী লীগ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে' প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললে পুলিশের নির্যাতনে শহীদ হয় অনেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে ১১ দফাভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে। এই আন্দোলনের প্রথম শহীদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান পরে শহীদ হয় স্কুলছাত্র মতিউর রহমান। শহীদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের চাপে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয় লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে।

বাংলার মানুষের বন্ধু হিসেবে ভূষিত করার ফলে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দীক্ষার বিষয়টি সবার সামনে বিশাল হয়ে উঠেছিল। তৃণমূল পর্যায় থেকে শহরবাসী পর্যন্ত সবাই দেখেছেন তিনি কীভাবে ১৯৪৭ পরবর্তী সময় থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। ব্যক্তি স্বার্থ পূরণের জন্য তিনি কখনো চিন্তা করেননি। বাঙালি জাতির পুরো স্বার্থ ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনার বড় পরিসর। মানুষের অধিকার বুঝতে তিনি শুধু বাঙালির অধিকারের বিষয় বোঝেননি। পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের মানুষের অধিকারের কথা তিনি চিন্তায় রেখেছিলেন। বঞ্চিত সিন্ধি, পশতু, বেলুচ, পাঠান জনগণের কথাও তিনি ভেবেছিলেন।

৬ দফা একটি জাতির স্বাধিকার বোধের নিশ্চয়তা ছিল। পাকিস্তান সরকার তা মানেনি। ক্ষতি হয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের। ২৩ বছরের রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থনা ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকার পরে দেশের সাধারণ নির্বাচনে সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অধিকার অর্জন করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে বঞ্চিত করে। ৬ দফার পাঁচ বছর পরে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হন।

সত্তরের নির্বাচন থেকে একাত্তরের অসহযোগ

সেলিনা হোসেন

সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন বাঙালির জাতিসত্তার প্রেক্ষাপটে জাগরণের শক্তি হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দুই পরিসরে মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালির আত্মজাগরণের জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন। এই দুটো জায়গায় নিজের ভূমিকাকে আত্মপ্রত্যয়ী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে বাঙালির মানসপটে বিপুলভাবে আত্মজাগরণের দরজা খুলে দেন। বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করে। শুরু হয় স্বাধীনতার স্বপ্নে নিরন্তর যাত্রার দুঃসাহসী ভূমিকা। সত্তরের নির্বাচন ও অসহযোগ আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল সাহসী চৈতন্যে ঐক্যবদ্ধ বাঙালির তোরণ উন্মোচন করেন। বিশ্বজুড়ে বাঙালির জাগরণ এবং স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা বিপুল সাহসী প্রত্যয় বিশ্বের মানচিত্রে প্রলয় ঘটায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতার আসনে আসীন করে বাঙালি নিজের জাতিসত্তার বিকাশ ঘটায়। পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ফিরে দেখা যাক ইতিহাস। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখলের পর সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানে কোনো সাধারণ নির্বাচন হতে দেননি। সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা দখল করে আইয়ুব খান নির্বিচারে দেশকে শাসন করে ১৯৬৯ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে অপসারিত হয়ে আর একজন সামরিক ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করেন।

সাতচল্লিশ-পরবর্তী সময় থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতির অধিকারের প্রশ্নে প্রবলভাবে সচেতন ছিলেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ব বাংলা বলুন বলে দাবি করেছিলেন। বাঙালির আত্মমর্যাদার জায়গাকে তিনি নিরন্তর স্মরণ করিয়েছেন দেশবাসীকে। ছয় দফা সনদে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর রাজনীতির সচেতন বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল গণমানুষ।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি দ্রুতই সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন। ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবেন। পরবর্তী সময়ে আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। বলা হয় ১৯৭০ সালে ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদ এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত

হবে। এই ঘোষণায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল রাজনীতির মাঠের আসর সরগরম করে তোলে। কিন্তু যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে না। পূর্ব বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে সেপ্টেম্বর মাসে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় নির্বাচন পিছিয়ে দেন। জাতীয় পরিষদের জন্য ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের জন্য ১৭ ডিসেম্বর দিন ধার্য করা হয়।

১৯৭০ সালে ১২–১৩ নভেম্বর পূর্ব বাংলার দক্ষিণের উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সে সময় এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি এবং রিলিফ পাঠানোর বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। উপরন্তু, ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিদেশ থেকে রিলিফ সামগ্রী এলেও সেসব দুর্গত এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন দেরিতে। দেশবাসী ক্রুদ্ধ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের মানুষদের নিয়ে ত্রাণকাজে নিজেকে যুক্ত করেন। এই ঘটনায় প্রায় ১০ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করে। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এলাকায়। এরপর ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেখান থেকে উদ্ধৃতি : 'ক্ষমতার প্রত্যাশী আমি নই। তবে শক্তির প্রত্যাশী আমি বটে –– কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মহলের হাত থেকে দেশবাসীর স্বার্থ ও অধিকার ছিনিয়ে আনতে শক্তি আমার চাই-ই চাই। সে শক্তি যোগাতে পারেন কেবল আপনারাই।' তিনি আরও বলেন, 'আপনাদের চাহিদা মতো শাসনতন্ত্র পাস করিয়ে আনতে হলে অনিচ্ছুক প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় আমার চাই নির্ভেজাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি আপনারা আমাকে জাতি, ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে দেন, তাহলে ওয়াদা করছি আপনাদের স্বার্থ ও অধিকার আমি আদায় করে আনবই।' বিপুল ভোটের ব্যবধানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে।

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনা রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। ২৫১ জন এমএনএ ও ২৬৭ জন এমপিএকে শপথ বাক্য পাঠ করান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরে তিনি নীতিনির্ধারণী ভাষণ দেন। ভাষণের একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তোমরা ৮৫ জন, আমরা ১৫ জন। সামরিক বিভাগে তোমরা ৯০ জন, আমাদের দিয়েছে ১০ জন। বৈদেশিক সাহায্যের তোমরা খরচ করছ ৮০ ভাগ, আমাদের দিয়েছে ২০ ভাগ। মহাপ্রলয়ে দক্ষিণ বাংলার ১০ লাখ লোক মারা গেল। লাখ লাখ লোক অসহায় অবস্থায় রইল। রিলিফ কাজের জন্য বিদেশ থেকে হেলিকপ্টার এসে কাজ করে গেল, অথচ ঢাকায় একখানা মাত্র সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টার ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আর কোনো হেলিকপ্টার এল না। আমরা এসব

বে-ইনসাফির অবসান করব।'

সত্তরের সাধারণ নির্বাচন ছিল বাঙালির প্রাণের জোয়ার। এই জোয়ারের প্রবল ঢেউয়ে সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে তোলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিঃসন্দেহে বলা যায় স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে বিভোর বাঙালির সামনে দরজা খুলে যায়। প্রতি পদক্ষেপের হিসেবে উঠে আসে স্বাধীনতার সূর্য।

আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে দেয়। সত্তরের নির্বাচন বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর স্বার্থে অনুপ্রাণিত করে। বাঙালি বুঝতে পারে বঙ্গবন্ধু যে উদাহরণ দিয়ে পাকিস্তানি জনগোষ্ঠীর হাতে বাঙালির বঞ্চনার দিক তুলে ধরেছেন, তার নিরসনকল্পে ঐক্যের শক্তির সামর্থ্যে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এমন ঘোষণা করার পর আবার সেই তারিখ ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন ইয়াহিয়া খান।

শুরু হয় বাঙালির জীবনের নতুন অধ্যায়। সেদিন ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। বিসিসিপি ও আন্তর্জাতিক একাদশের মধ্যে। রেডিওতে এই খবর শুনে ঢাকায় বিক্ষুব্ধ মানুষ রাজপথে নেমে আসে। মতিঝিলের হোটেল পূর্বাণীতে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি কমিটির মিটিং করছিলেন। বিভিন্ন মিছিল বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কী করতে হবে, তা জানার জন্য পূর্বাণীর সামনে জমায়েত হতে থাকে। স্টেডিয়ামের দর্শকেরাও বেরিয়ে এসে হোটেল পূর্বাণীর সামনে জড়ো হয়। বঙ্গবন্ধু মিটিং থেকে উঠে এসে জনতার সামনে দাঁড়ান। বলেন, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিকেলে তিনি তাঁর মিটিং শেষ করে সংবাদ সম্মেলন করেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কঠোর প্রতিবাদ করেন। বলেন, বাংলার জনগণ প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশজুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে ২ মার্চ ঢাকা শহরে এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল পালনের ঘোষণা দেন। ৭ মার্চ রেসকোর্সে জনসভা হবে বলে জানান।

শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। বাঙালি জাতির এই অসাধারণ আন্দোলন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় অর্জন। বাঙালি বিশ্বের দরবারে দৃঢ় প্রত্যয়ে অবস্থান করছে। বাঙালি-বাংলাদেশের ইতিহাসে একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দিকদর্শন। বাঙালির আত্মজাগরণে অসহযোগ আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে যোদ্ধা জাতি হিসেবে বাংলাদেশের সৃষ্টি বাঙালির দীপ্ত পরিচয়। নতুন রাষ্ট্র

বাংলাদেশ পৃথিবীর সীমানায় বাঙালি জাতিসত্তার গৌরব ছড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠিত করেছে আত্মমর্যাদার পাটাতন। মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য জীবনদানকারী বাঙালি আজ বিশ্বের দরবারে নন্দিত। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২৫ সেপ্টেম্বর বাঙালির অর্জনের জোয়াবে ভাসিয়েছে পৃথিবীর দেশসমূহ। এই অর্জনে নেতৃত্ব দানকারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের জনগণের সামনে দীপশিখা। তারা সগৌরবে বলবে 'আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।'

১৯৭১ সালের ১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেলা একটার সময় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই হীন ষড়যন্ত্রে রোষে ফেটে পড়ে জনতা। মুহূর্তে ঢাকা শহর এক বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। প্রতিবাদ, মিছিল আর স্লোগানের শহরে রূপান্তরিত হয়। বঙ্গবন্ধু সে সময়ে হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত মিটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হাজার হাজার মানুষ হোটেল পূর্বাণীর সামনে সমবেত হয়। উত্তেজিত জনতা প্রবল ঘৃণায় পাকিস্তানের পতাকা ও জিন্নাহর ছবি পুড়িয়ে ফেলে। বঙ্গবন্ধু জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনে ২ মার্চ থেকে হরতাল পালনের আহ্বান জানান। সাংবাদিকরা তাঁকে জিজ্ঞেস, করেছিলেন, 'বাইরে উত্তেজিত জনগণ আপনার নির্দেশ চায়। আপনি কী বলবেন তাদের?' জবাবে তিনি বলেন, 'সাত তারিখে সব জানতে পারবেন।' সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, 'লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।'

৩ মার্চ সারা দেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এই দিন ঢাকায় জাতীয় সংসদ অধিবেশনের উদ্বোধনী দিন ছিল। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এই দিন 'শোক দিবস' বলে উল্লিখিত হয়। পল্টন ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ডক্টর মাযহারুল ইসলাম অনুদিত অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাসের 'রেপ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, 'দেশের শাসনক্ষমতা ক্রমশ শেখ মুজিবের হাতে চলে গেল। শেখ মুজিবের নির্দেশ ছাড়া আর কোন নির্দেশ এ সময় পালিত হয়নি। ইয়াহিয়া সরকারের ক্ষমতা শুধুমাত্র ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশের একজন সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে হাইকোর্টের বিচারপতি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশকেই সরকারি আদেশ বলে শিরোধার্য করেছিল।'

৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় একটি ইস্তাহার পাঠ করা হয় স্বাধীন-সার্বভৌম

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বলা হয় ৫৬ হাজার ৫ শত ৭১ বর্গমাইল বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার ৭ কোটি মানুষের জন্য আবাসভূমি হিসাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম এ রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ।

৪ মার্চ মীরপুর, মোহাম্মদপুরে অবাঙালিদের জনসভা হয়। তারা অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করে। এই তারিখে 'দ্য পিপল' পত্রিকার হেডলাইন ছিল - Mujib's call to Bengalees : be prepared to continue struggle for emancipation- extreme sacrifices alone can attain freedom.

বঙ্গবন্ধু নির্দেশ দেন যে ব্যাংক এবং সরকারি অফিসসমূহ আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। শিল্পী সমাজ জানায় যতদিন সংগ্রাম চলবে ততদিন রেডিও-টিভিতে অনুষ্ঠান করবে না। আবুল মনসুর আহমদ পাকিস্তান সরকারের খেতাব ও তমঘা বর্জনের আবেদন জানান।

৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে তাঁর অসাধারণ ভাষণটি দিয়ে দেশবাসীকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

৯ মার্চ বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন।

১২ মার্চ বাঙালি সি.এস.পি. অফিসাররা্ অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। তাঁরা আওয়ামী লীগের ত্রাণ তহবিলে এক দিনের বেতন দানের সিদ্ধান্তের কথা জানান।

১৩ মার্চ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ১১৫নং সামরিক আইন আদেশ জারি করে। আদেশে বলা হয়, 'যারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করে ১৫ মার্চের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে চাকরি যাবে।' আরও বলা হয় যোগদানে ব্যর্থ হলে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হবে।

১৪ মার্চ কর্মচারিরা সামরিক আইন অমান্য করে এর বিরুদ্ধে মিছিল বের করে। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশের জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'উস্কানিমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করুন।' তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'বাঙালিদের স্বাধীনতার উদ্দীপনা কেউ দমাতে পারবে না।'

বঙ্গবন্ধু মার্চের ১৪ তারিখে ৩৫টি নির্দেশ জারি করে বাংলাদেশের প্রশাসন সামগ্রিকভাবে নিজে নিয়ন্ত্রণ করেন। তৈরি হয়ে যায় পাকিস্তান সরকার বনাম

বঙ্গবন্ধুর সরকার।

১নং নির্দেশ

সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ এবং দেশের সব আদালত হরতাল পালন করবে।

২নং নির্দেশ

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৩নং নির্দেশ

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অফিসসমূহ তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

৪নং নির্দেশ

নৌযান চলাচল চালু থাকবে। বিশেষ করে খাদ্য-শস্য বহন করে আনা জাহাজ থেকে মাল খালাস করতে হবে।

৫নং নির্দেশ

আমদানি করে আনা সকল মাল খালাস করতে হবে।

৬নং নির্দেশ

রেলওয়ে চালু থাকবে।

৭নং নির্দেশ

বাংলাদেশের সব জেলায় ইপিআরটিসি বাস চলাচল করবে।

৮নং নির্দেশ

অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৯নং নির্দেশ

ডাক ও টেলিগ্রাম অফিস চালু থাকবে।

১০নং নির্দেশ

টেলিফোন ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১১নং নির্দেশ

বেতার, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে আন্দোলন বিষয়ের সব খবর প্রচার করতে হবে।

১২নং নির্দেশ

সব হাসপাতালে স্বাস্থ্য বিষয়ক সব ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

১৩নং নির্দেশ

বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সব বিভাগ কাজ করবে।

১৪নং নির্দেশ

পানি ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে।

১৫নং নির্দেশ

কয়লা সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে ইটের ভাটা ও অন্য কাজের জন্য।

১৬নং নির্দেশ

খাদ্য সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১৭নং নির্দেশ

কৃষি বিষয়ে নানা নির্দেশ দেয়া হয়।

১৮নং নির্দেশ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও শহর সংরক্ষণ বিষয়ে নানা ব্যবস্থার কথা বলেন।

১৯নং নির্দেশ

উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ বিষয়ে বলেছেন, এই কাজ সুচারুরূপে চলবে।

২০নং নির্দেশ

দুর্গত এলাকায় সাহায্য ও পুনর্বাসন যথাযথভাবে চলবে।

২১নং নির্দেশ

ইপিআইডিসি, ইপসিক কারখানা ও ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ ঠিক মতো চলবে।

২২নং নির্দেশ

বেতন দান : সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মচারিসহ যে যেখানে কাজ করছেন তাদের বেতন ঠিকসময়ে দিতে হবে।

২৩নং নির্দেশ

পেনশন : অবসরপ্রাপ্ত সবাইকে নির্ধারিত তারিখে পেনশন দিতে হবে।

২৪নং নির্দেশ

এজি অফিস ও ট্রেজারিতে কিছু সংখ্যক লোক কাজ করবেন বেতন দেয়ার জন্য।

২৫নং নির্দেশ

ব্যাংকিং কাজের জন্য সব ব্যাংক খোলা থাকবে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

২৬নং নির্দেশ

স্টেট ব্যাংক খোলা থাকবে এবং অফিস সময় একই থাকবে।

২৭নং নির্দেশ

আমদানি-রফতানির অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

২৮নং নির্দেশ

ট্রাভেল এজেন্ট ও বিদেশী এয়ারলাইন্স ট্রাভেল এজেন্টদের অফিস ও বিদেশি এয়ারলাইন্স অফিস চালু থাকবে।

২৯নং নির্দেশ

ফায়ার সার্ভিস আগুন নেভানোর ব্যবস্থা চালু রাখবে।

৩০নং নির্দেশ

পৌরসভা : পৌরসভার সব কাজের ব্যবস্থা চালু থাকবে।

৩১নং নির্দেশ

করদান বন্ধ রাখা: পরবর্তী নির্দেশনা দেয়া পর্যন্ত করদান ব্যবস্থা বন্ধ থাকবে।

৩২নং নির্দেশ

পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে।

৩৩নং নির্দেশ

ব্যবসা ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

৩৪নং নির্দেশ

সব বাড়ির উপর কালো পতাকা উড়তে থাকবে।

৩৫নং নির্দেশ

সংগ্রাম পরিষদ তাদের কাজ করে যাবে।

এই নির্দেশসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হয়েছে।

২৪ তারিখে ইয়াহিয়া খান ভূট্টো সবার সঙ্গে আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়ির

সামনে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আন্দোলন নস্যাতের চক্রান্ত চলছে। আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাঙালির সঙ্গে আমি বেঈমানী করতে পারব না। জয় বাংলা থাকবে, ক্ষয় বাংলা করতে পারবে না।'

২৫ মার্চ বিকেলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা ছেড়ে চলে যান। অথচ মুজিব-ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাষণ দেয়ার কথা ছিল সন্ধ্যা সাতটায়। রাত দশটা সাড়ে দশটার দিকে সেনাবাহিনী ক্যান্টমেন্ট ছেড়ে ঢাকার রাজপথে বেরিয়ে আসে। শুরু করে বাঙালি নিধন-যজ্ঞ। জঘন্যতম গণহত্যার সূচনা করে।

বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা : 'This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.' মার্চ মাসের ২৫ দিন তাঁর নির্দেশনায় এক উত্তাল সময় অতিবাহিত হয়। তিনি তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত ২৫ দিন ধরে যেভাবে পাকিস্তান সরকারের বিপরীতে যেভাবে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা এক অসাধারণ রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ। তিনি বাঙালির আত্মজাগরণের দীপশিখা।

বাঙালির সর্বাত্মক চেতনায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধে দুঃসাহসী বোধ প্লাবিত হয়। সাহসের দুর্জয় ঘাঁটি নিয়ে দেশের সব স্তরের মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন প্রতিরোধের আলোকে। ৭ মার্চের বক্তব্যে ঘোষিত হয়, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বাঙালির অস্তিত্বের প্রতিটি রক্তকণায় ঢুকে যান চিরঞ্জীব শেখ মুজিব। অসহযোগ আন্দোলনের ২৫ দিন পূর্ব বাংলার বাঙালি তাঁর নির্দেশে দেশ পরিচালনার সবটুকু জায়গা নিজেদের মধ্যে ধারণ করেন। পাকিস্তান সরকারের বিপরীতে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সরকার পরিচালনা পাকিস্তানের ইতিহাসে এক ভিন্ন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে।

এভাবে সত্তরের নির্বাচন এবং অসহযোগ আন্দোলন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালি জাতিকে মানসম্মত জায়গায় উন্নীত করার দিকনির্দেশনা। জন্ম হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের। বাঙালির অমরত্বের সাধনাকে জাতিগোষ্ঠীর বিনির্মাণে উদ্ভাসিত রাখেন। যে কারণে তিনি পাকিস্তানের

কারাগার থেকে ফিরে এসে ১০ জানুয়ারির ভাষণে বলেছিলেন, 'ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।' বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ একমাত্র রাষ্ট্র, যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ এক গৌরবময় অর্জনের উন্নয়নশীল দেশ।

তথ্যসূত্র :

১. শেখ মুজিব
বাংলাদেশের আরেক নাম
আতিউর রহমান
আলোঘর প্রকাশনা, মীরপুর, ঢাকা, ২০১৮।

২. স্বাধীনতার মহানায়ক
এম আর এ তাহা
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৮।

৩. মুক্তিযুদ্ধ কোষ (তৃতীয় খণ্ড)
মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত
সময় প্রকাশন, ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৫।

ভাষণের পূর্ণমাত্রায় বাঙালির বিজয়

সেলিনা হোসেন

২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবরে প্যারিসের ইউনেস্কো সদর দপ্তরে মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা ঘোষণা দিলেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি 'বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ। ইউনেস্কো জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এই স্বীকৃতি ইতিহাসের বড় সময় ধরে বিশ্বজুড়ে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি করেছে। বলতেই হবে বাঙালি-বাংলাদেশের ইতিহাস এই ৭ই মার্চের ইতিহাস। ইউনেস্কোর মাধ্যমে বাঙালির অর্জন বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্য মানবজাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়। প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে মানুষের মানবিক অধিকারকে নিশ্চিত করে।

চল্লিশের দশকে প্রখ্যাত মনীষী এস. ওয়াজেদ আলি এমন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি তাঁর 'ভবিষ্যতের বাঙালি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন : 'রাষ্ট্রজীবনের যে পরিকল্পনা, সামবায়িক জীবনের যে ছবি বাংলাদেশের বাইরের

ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করে, এই ভাবপ্রবণ কল্পনাকুশল জাতি সে-আদর্শ, সে-ছবি, সে-পরিকল্পনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। তার কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নিগূঢ় অব-চেতনায় মহামানবতার মহত্তর এক আদর্শ, পূর্ণতর এক পরিকল্পনা, সুন্দরতর এক ছবি আঁকার এবং রূপ পরিগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে সেই মোহনীয় আদর্শ, সেই পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, সেই অপরূপ ছবি তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠবেই, আর তার প্রভাবে বাঙালী এক অভিনব জীবনের আস্বাদ পাবে; এবং সেই শুভ দিন যখন আসবে, তখন বাঙালী কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য-ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে- সত্য, সুন্দর শুভ জীবন-পথের। বাঙালী এখন সেই মহামানবের প্রতীক্ষায় আছে, যিনি তাকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন- ভগীরথের মত এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন।' বাঙালির সামনে অসাধারণ স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। বাঙালি বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক হবে। 'এখন বাঙালি কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য ভূখন্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক হবে – সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন-পথের।' চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক – মাত্র দু-দশক সময়ের ব্যবধানে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চের ভাষণের ইউনেস্কো স্বীকৃতি বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শকের জায়গায় স্থান দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু এমনই এক রাজনৈতিক নেতা যিনি ভারত উপমহাদেশের মানচিত্র বদলে দিয়েছেন। বাঙালিকে যোদ্ধা জাতি হিসেবে বিশ্বের

মানুষের সামনে পরিচিত করিয়েছেন। বাঙালির এই অর্জন আজকের পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের সামনে একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। প্রাবন্ধিক এস. ওয়াজেদ আলীর প্রত্যাশিত মহামানব শেখ মুজিবুর রহমান।

বাঙালির প্রতি বঙ্গবন্ধুর আবেগ ছিলো সীমাহীন, বাঙালিকে কেন্দ্র করে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিলো মৃত্তিকাসংলগ্ন এবং সমুদ্রসমান ভালোবাসা দিয়ে এ জাতিকে গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবার স্বপ্নে তৈরি করেছিলেন নিজের সবটুকু। তিনি ভেবেছিলেন, একটি ভাষাগত ও জাতিগত রাষ্ট্রের উদ্ভব হলে তা এ সময়ের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে যদি অনেক রাষ্ট্রের জন্ম হয় তাহলে আর কোনো বৃহৎ শক্তি থাকবে না। কেউ কারো ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে না। শান্তি ও কল্যাণের রাষ্ট্র হবে সেগুলো। আগামী দিনের প্রজন্ম জানবে না বিশ্বযুদ্ধ কী! বাংলাদেশের মতো একটি একটি করে গড়ে উঠবে অসংখ্য রাষ্ট্র। অসংখ্য রাষ্ট্রের যোগ সাধনে তৈরি হবে সমতার পরিবেশ। তিনি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে এই জীবনদর্শনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন : 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিবাদী সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন দুনিয়ায় থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধ পরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্বশান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা।'

সেই ভাষণে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন একটি অলৌকিক বাক্য। তর্জনি তুলে বলেছিলেন, 'আর দাবায়ে রাখতে পারবা না।' বাক্যটি ভেবে দেখতে হবে। তিনি যদি প্রমিত বাংলা ব্যবহার করতেন তাহলে বলতেন, 'আর দাবিয়ে রাখতে পারবে না।' তিনি প্রমিত বাংলা ব্যবহার করেননি। আঞ্চলিক শব্দ সহযোগে আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে বাঙালি জাতিসত্তার হৃদয়ের বিশাল দরজা খুলে দিয়েছেন, যে দরজা পথে বেরিয়ে এসেছে বাঙালি চরিত্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি তিনি বিশ্বজোড়া মানুষের অধিকারের জায়গাটি মর্যাদার সঙ্গে ধারণ করেছেন। ছোট রাষ্ট্রগুলো যেন বৃহৎ শক্তির পুঁজিসর্বস্ব গঠন কাঠামোয় অবদমিত না থাকে। মানুষের অধিকার অর্জন মানবজীবনের মৌলিক সত্য।

এই ছোট্ট বাক্যটি সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছে এস. ওয়াজেদ আলির একটি দীর্ঘ বাক্যের সঙ্গে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'বাঙালি এখন সেই মহামানবের প্রতিক্ষায় আছে। যিনি তাঁকে এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেবেন – ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম সুস্পষ্ট করে তুলবেন'। পার্থক্য এই যে, তাঁকে দীর্ঘ অর্থবহ বাক্য রচনা করতে হয়নি, তিনি রচনা করেছেন ছোট অথচ তীক্ষ্ণ, অপ্রমিত

অথচ গভীর অর্থবহ বাক্য। এই একটি মাত্র বাক্য মানুষের অধিকারের পুরো জায়গা খুলে দেয়। মানুষ পীড়ন-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা পায়।

৭ই মার্চের ভাষণে সেদিন তিনি সেই বাক্যটির পরে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই বাক্যটি তিনি প্রমিত বাংলায় বলেছেন। এখানেও এস. ওয়াজেদ আলির আর একটি বাক্যের সঙ্গে সংযোগ-সেতু রচিত হয়। কি আশ্চর্যভাবে এই ভাষণ জাতীয় পটভূমি থেকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় উন্নীত হয়েছে – মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রতিটি দেশের জন্য সর্বজনীন সত্য। মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম এককভাবে হয় না, এরজন্য প্রয়োজন হয় আন্তর্জাতিক সমর্থন, সাহায্য এবং সহযোগিতা। তাই বাক্যটি উচ্চারিত হয় প্রমিত বাংলায়। বাঙালি জাতিসত্তার উর্ধ্বে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধনের প্রত্যাশায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভগীরথের মতো এই বাংলায় ভাবগঙ্গার সঙ্গম। সেদিনের বক্তৃতায় তাঁর উত্থিত সেই অমিত বিক্রম তর্জণীর সঙ্গে কণ্ঠস্বর যখন একই সমান্তরালে পৌঁছে যায়, তখনই বাঙালির অভিনব জীবন আস্বাদের স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে।

এই ভাষণের প্রতিটি বাক্যই বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। 'আর দাবায়ে রাখতে পারবে না' বাক্যটি সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক বিষয় স্পষ্ট করে দেয়। এই বাক্যটি দেশের সীমানা অতিক্রম করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যশোরের কালীগঞ্জ গ্রামের একটি ঘটনা। আমার শিক্ষক গবেষক- ফোকলোরবিদ অধ্যাপক আবদুল হাফিজ মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংবাদিকতা করেছেন। স্বাধীনতার পরে সেই ঘটনাটি আমাকে বলেছিলেন। যশোরের একজন মা দুজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য বোবা সন্তানটি মিলিটারির হাতে তুলে দিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেলটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে। একজন গ্রামীন নারীর এই আত্মত্যাগ একটি ভাষণের অনুপ্রেরণায় স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : 'আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি.....।' বাঙালি নারী এই বাক্যেই বুঝে গিয়েছিলেন যে তাঁদের কি করতে হবে। এই বেদবাক্য মাথায় তুলে নিজেদের সাধ্যমতো কী করতে হবে তার সব করেছেন। কোথাও কোন দ্বিধা ছিল না। একজন জ্ঞানের মানুষ খুরশীদা বেগম এই ভাষণকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে, 'যুগে যুগে বাঙালির ইতিহাসকে স্বপ্ন ও সাধনা দিয়ে ধন্য করেছেন যে সকল বরেণ্য রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক শিল্পী সমাজসেবী এবং সাধারণ মানুষ তাঁদের সকলের অবদানকে একটি পরম আকাঙ্ক্ষা ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে সংস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মানুষটি তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

রহমান এবং ইতিহাসের যে মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁর হাতে সম্পাদিত হয় এই কাজ, সেটি ৭ই মার্চ, ১৯৭১।'

একজন স্বল্পশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে তারামন বিবি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর শক্তি এই ভাষণের অনুপ্রেরণা থেকে এসেছে। একটি জনজীবন সে ভাষণটিকে কীভাবে ধারণ করেছে শুধু বাংলার নারী সমাজের দিকে তাকালে এ উপলব্ধি সবার হবে। সিলেটের কাঁকন বিবির কথা বলা যায়, যিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রসদ সরবরাহ করেছেন, অস্ত্র সরবরাহ করেছেন আবার পাকিস্তানী সেনার ক্যাম্পে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ছিল না। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ তাঁদের করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেই অমিত ডাক শুনে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেইদিন ৭ই মার্চের সেই সভায় নারীদের হাতেও বাঁশের লাঠি ছিল। এই ভাষণটি মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাঙালিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছে।

এই ভাষণ কী করে দেশের সীমানা অতিক্রম করল এটা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। তিনি বলেছেন যে বিদেশে কোনো একটি জায়গায় একজন কাশ্মীরের গেরিলাযোদ্ধার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, নানা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এভাবে কি আপনারা অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবেন? সেই গেরিলাযোদ্ধা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলেছিলো, Are you from Bangladesh?

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট ছোট দেশগুলোর জনগণের কাছে এভাবেই পৌঁছে গেছে। এ পৌঁছে যাওয়া শুধু একটি ঘটনা নয়। এর পিছনে আছে হাজার বছরের একজন মানুষের অভিজ্ঞান নিয়ে হাজার বছরের ইতিহাসকে নিজের মধ্যে ধারণ করে এগিয়ে যাওয়া। আমাদের প্রাজ্ঞ মনীষী সরদার ফজলুল করিম ৭ই মার্চের ভাষণ শুনেছেন রমনা রেসকোর্সে বসে। তিনি লিখেছেন, 'আমি নিজেকে যত ক্ষুদ্রাবয়ব মনে করি, তেমন আর তখন যথার্থই ছিলাম না। আমার অবয়বকে আমি যথার্থই ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দেহ আমার দীর্ঘ হচ্ছিল। শরীরে আমার রোমাঞ্চ জাগছিল। সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর তাই পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে যখন আসা-যাওয়া করছিল এবং সে বিমান থেকে যে কোনো মুহূর্তে যে মৃত্যুর বাণ আমর বুকে এসে বিঁধতে পারে, সে কথা জেনেও আমার পা একটুও কাঁপছিল না। আমি ছুটে পালাতে চেষ্টা করিনি।'

ভেবে নেওয়া যায় যে, এমন উঁচু হয়ে ওঠা মাথার চিত্রকল্প নিয়েই রচিত হয়েছিলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বল বীর চির উন্নত মম শির'।

ভারতের উর্দু ভাষার বিখ্যাত কবি কাইফি আজমী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লিখেছিলেন 'বাংলাদেশ' শীর্ষক কবিতা:

'শুধু তো একটি দেশ নই যে জ্বালিয়ে দেবে

প্রাচীর নই যে তা পুরোপুরি মুছে ফেলবে

....

কতই না নির্বোধ তুমি

খয়রাতে পাওয়া ট্যাংক নিয়ে আমার দিকে ধেয়ে আসছ

রাত দিন নাপাম বোমার বৃষ্টি বর্ষাচ্ছ

ক্লান্ত হয়ে পড়বে দেখো

শৃঙ্খল পরাবে তুমি কোন হাতে

হাত তো আমার আছে সাত কোটি

গর্দান থেকে কোন মাথাটি তুমি আলাদা করবে

সেখানে তো মাথা আছে সাতকোটি।'

কী আশ্চর্য মেলবন্ধন! এভাবেই বুঝি কবিতার ভাষার সঙ্গে রাজনীতি এক হয়। মুখোমুখি দাঁড়ান কবি ও রাজনীতিবিদ। 'আর দাবায়ে রাখতে পারবা না' পঙ্‌ক্তিটিও একটি কালজয়ী পঙ্‌ক্তি। মর্যাদার সঙ্গে মানবজাতির বেঁচে থাকার এক অবিনাশী পংক্তি। এই পংক্তির ক্ষয় নেই। বিনাশ নেই। এমন একটি পংক্তি হাজার বছরের ইতিহাস হয়ে টিকে থাকে।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশে দেয়া এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন, '১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষার জন্য আন্দোলন ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আর মানুষের মতো বাঁচার অধিকারের সংগ্রাম। সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি। এই আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকারের আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন।'

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ প্রথমবারের মতো শহীদদের স্মরণ করবেন। ভাষার জন্য সংগ্রামকে যথাযথ মর্যাদা দেবেন। দেশে শোষণমুক্ত সমাজ গঠিত না হলে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার কোনো অর্থ থাকবে না। আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো শহীদ দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি। ১৯৪৭ সালের ১১ই মার্চ থেকে সংগ্রাম শুরু হয়।

সেদিন আমরা গ্রেফতার হয়েছিলাম। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, শুধু ভাষা আন্দোলন ছিল না এবং কেবলমাত্র ভাষা আন্দোলনই সেদিন শুরু হয়নি। এ আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতার আন্দোলন। ১৯৪০ সাল থেকে ধীরে ধীরে এ সংগ্রাম শুরু হয় '৫২ সালে গিয়ে সেই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সেদিন আমাদের দেশের ছেলেরা রক্ত দিয়েছিল, শহীদ হয়েছিল বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু সেটা কি শুধু ভাষা আন্দোলন ছিল? অনেকেই বুঝতে চেষ্টা করেনি যে বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে। বাংলার মানুষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল চরম সংগ্রামের প্রস্তুতি।' (দৈনিক বাংলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধু একজন নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্বের অবদানকে গভীর দিকনির্দেশনায় পরিচালনা করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম দেন।

ইতিহাসে তিনিই অমর, যিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখাতে পারেন – ইতিহাস তাঁরই পক্ষে যিনি সময়ের বিচারে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন। এ সংজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইতিহাসের সেই মহামানব, সময় যাঁকে সৃষ্টি করেনি, যিনি সময়কে নিজের করতলে নিয়ে এসেছেন। যিনি কঠোর স্বরে নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন সব কালের উপযোগী এবং সব দেশের জন্য প্রযোজ্য একটি অমর পঙ্‌ক্তি 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব – এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ –।' রক্ত দেয়া অর্থবহ হয় নিজের জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞায়। এই প্রতিজ্ঞা মুক্তিকামী মানুষের ঘরে ঘরে উচ্চারিত না হলে মুক্তির লক্ষ্য অনিবার্য হয়ে ওঠে না। ইউনেস্কোর বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছালে এই ভাষণের তীব্রতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে মানুষের চেতনায়। সেজন্য ইউনেস্কোর এই দলিল সংরক্ষণের উদ্যোগ। মানুষের জীবন যেন ন্যায়সঙ্গত সমতার বিচারে মহীয়ান হয়ে চির জাগরুক থাকে। বিশ্ব সংস্থার এমন আবেদনই সকলের প্রত্যাশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষ জীবনে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে আশা করেছিলেন : 'আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য লাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। ..... মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল

আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।'

যে পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ এই কথাগুলো বলেন, সেটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু এই কথাও সবাইকে বঙ্গবন্ধুর কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি আমাদের যেভাবে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, মানুষ হিসেবে মানুষকে যে আশ্বাসের কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, এ দেশে এমন আর কে চেয়েছেন। তিনি পরিষ্কার উচ্চারণে বলেছেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' তিনি আরও বলেছেন, '২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কথার একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের মানবপীড়ন দেখে যে ক্ষোভ থেকে পরিত্রাণকর্তার আবির্ভাব চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা পূরণ করেছেন অমৃতের সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষায় তাঁর অবদান আজ বিশ্বনন্দিত। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি আজ অমর মানুষ।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনই প্রতিফলিত হয় ভাইয়েরা আমার উচ্চারণে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মিক যোগ ঘটে এই সম্বোধনে। এই যোগ দেশ ও সমাজের পরিপূরক। সেখানে মানুষ যেমন রাষ্ট্রের অধিকার পাবে, তেমন পাবে মনুষ্যত্বের চেতনায় মানবিক মর্যাদা। এই ভাষণ বিশ্বের সামনে তুলে ধরল বাংলাদেশের অর্জন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার' সম্বোধন করে। ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত ভাষণে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে বিশ্বজুড়ে। তিনি বিশ্ববাসীকে জড়ো করে বলছেন, ভাইয়েরা আমার। ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কর্মসূচির অ্যাডভাইজরি কমিটির ১৫ জন সদস্য দুই বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক দলিলসমূহ গভীর পর্যবেক্ষণের আওতায় এনে যে সিদ্ধান্ত দিল তাতে বাঙালির দরজা খুলে গেছে বিশ্ববাসীর সামনে।

২০০১ সালের ২২ থেকে ২৬ জানুয়ারি কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো শান্তির পক্ষে একটি সম্মেলন। সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তা

ছিল এসোসিয়েশন অব এশিয়ান পার্লামেন্টস ফর পিস। এশিয়ার ঊনত্রিশটি দেশের সংসদ সদস্যরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। একই সঙ্গে এই সম্মেলনে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আমিও একটি আমন্ত্রণ পাই এবং সম্মেলনে যোগদান করি। উজবেকিস্তানের প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তিনি ছিলেন শান্তির পক্ষে সোচ্চার একজন ব্যক্তিত্ব। আজকের এই সম্মেলনে আমি তাঁকে স্মরণ করছি।

পরদিন কিংডম অব টোঙ্গা থেকে আগত প্রতিনিধি একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়েন। সেখানে তিনি বলেন, I have dream of the Pacific Island and its people as the people of peace, as a rejection of Peace and the Pacific as an ocean of peace if the Exclusive Economic Zone (EEC) is acceptable globally, why not an Exclusive Zone for Peace (EZP), why not, if we agreed, to start peace within ourself, and between yourself, and let our fellow human being not only feel, but experience the wave of peace through the new currents of the pacific, the current of peace, why not give solidarity to the Pacific way- a concept based on tolerance, and understanding, unity in diversity and respect for one and all.

পরে তিনি বলেছেন, এটা অনেকের কাছে স্বপ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু এটা শুধুই স্বপ্ন নয়। পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোক এ স্বপ্ন দেখেছেন। যেমন : "Jefferson, Adam, Madison, Benjamin Frankilin, and many others had this dream and look at the United States of America-Martin Luther King, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman of Bangladesh had this dream, and though it cost their life, we live in a world of more freedom and greater peace because of their supreme sacrifice."

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ কিংডোম অব টোঙ্গার একজন লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য যে সর্বোচ্চ ত্যাগের কথা উল্লেখ করেন, তখন বুঝতে হবে বঙ্গবন্ধু তাঁর কর্মফল নিয়ে এমন ছোট ছোট দেশের মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। নিজের জীবনকে অন্যের কাছে উদাহরণ হিসেবে তৈরি করা সহজ কথা নয়। এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন বলেই তিনি জাতির কাছে মৃত্যুঞ্জয়।

ইউনেস্কো যে ৭ই মার্চের ভাষণকে মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে তা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা স্মরণ করায়। ইউনেস্কো আমাদের ২১শে

ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা সবসময় বলি, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের এই দুই গৌরবময় অর্জন ইউনেস্কোর স্বীকৃতির মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেল।

এর আগে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ Jacob F. Field একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন 'We shall Fight on The Beaches – The Speeches That Inspired History' শিরোনামে। গ্রন্থটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'The Struggle This Time is the Struggle for Independence' শিরোনামে। ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থটি বিশ্বের অসংখ্য মানুষের কাছে পৌঁছেছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ভাষণটির অনুবাদ হলে বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছাবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে এমন প্রত্যাশা দেশবাসীর। রবীন্দ্রনাথের পূর্বদিগন্ত আজকের বাংলাদেশ। তাঁর কবিতার পংক্তি দিয়ে বিশ্ববাসীকে বঙ্গবন্ধুর আগমন বার্তা দিয়েছেন এভাবে:

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক
এল মহাজন্মের লগ্ন। ....

এই ভাষণ বিশ্বজোড়া নিপীড়িত মানুষের সামনে প্রতিরোধের প্রেরণা। মানুষের অধিকার আদায়ের জয়গানে মুখরিত হবে ভাষণের পংক্তিমালা। বিশ্বজয় এই ভাষণের দিগন্তপ্রসারী বিস্তার।

তথ্যসূত্র :

১. এস ওয়াজেদ আলী, রচনাবলী-১, বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল-১৯৮৫

২. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ইতিহাস ও তত্ত্ব, সম্পাদক : আবদুল ওয়াহাব, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল-২০১৪

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী-২৬, বিশ্বভারতী, ৬, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-১৭, প্রকাশকাল-বৈশাখ ১৩৭৩

৪. কাইফি আজমীর নির্বাচিত কবিতা, অনুবাদ : জাফর আলম, মাওলা ব্রাদার্স,

৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল-২০০৬

৫. অসমাপ্ত আত্মজীবনী- শেখ মুজিবুর রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, প্রকাশকাল-জুন ২০১২

৬. We shall Fight on The Beaches – The Speeches That Inspired History -Jacob F. Field, প্রকাশক- মাইকেল ও'মারা, ৯, লায়ন ইয়ার্ড, ট্রেমাডোক রোড, লন্ডন, এস ডাব্লিউ ৪, ৭ এন কিউ, প্রকাশকাল-ডিসেম্বর ২০১৩

সামাজিক আদর্শ ও বঙ্গবন্ধু

সেলিনা হোসেন

পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাস সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করে। মানুষের একত্রে বসবাসের জন্য এই ব্যবস্থা খুবই জরুরি। নইলে প্রত্যেক মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনযাপন করতে হয় যেটা কোনোভাবে কাম্য নয়। যৌথভাবে জীবনযাপন করলে মানুষ মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ না হলে বিপর্যয় ঘটে সমাজব্যবস্থায়। সেজন্য রাষ্ট্র আইন করে নানা নিয়মনীতি প্রচলন করে। মানুষ সেই আইন মেনে চলে। আইনের বরখেলাপ হলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। সেজন্য সামাজিক আদর্শ মানবচেতনার বড় দিক। পরস্পরের সঙ্গে সম্প্রীতির জায়গা রক্ষা করার জন্য আইন মেনে চলতে হয়। আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষ যখন সামাজিক আদর্শ জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে পথ চলে তখন সে একজন আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়। সবাই তাকে মান্য করে। প্রয়োজনে তার কাছে গিয়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান দিতে বলে।

আদর্শগত দিক ছাড়া সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয় না। সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে বিপন্ন হয় মানুষের জীবন। কারণ যে যার ইচ্ছেমতো যেমন খুশি তেমন

ভাবে জীবন কাটাতে পারে না। একজনের বিশৃঙ্খলা আর একজনকে সমস্যায় ফেলে। সেজন্য গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে সামাজিক আদর্শ রক্ষা করা সামাজিক মূল্যবোধের ন্যূনতম শর্ত।

বঙ্গবন্ধু কিশোর বয়স থেকে সামাজিক আদর্শের দিকটি নিজের মধ্যে লালন করতে শিখেছিলেন তাঁর শিক্ষক আবদুল হামিদের কাছ থেকে। বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন : "এই সময় আব্বা কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার সাহেবকে আমাকে পড়াবার জন্য বাসায় রাখলেন। তাঁর জন্য একটা আলাদা ঘরও করে দিলেন। গোপালগঞ্জের বাড়িটা আমার আব্বাই করেছিলেন। মাস্টার সাহেব গোপালগঞ্জে একটা 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেন, যার দ্বারা গরিব ছেলেদের সাহায্য করতেন। মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠাতেন সকল মুসলমান বাড়ি থেকে। প্রত্যেক রবিবার আমরা থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি থেকে চাউল উঠিয়ে আনতাম এবং এই চাল বিক্রি করে তিনি গরিব ছেলেদের বই এবং পরীক্ষার ও অন্যান্য খরচ দিতেন। ঘুরে ঘুরে জায়গিরও ঠিক করে দিতেন। আমাকেই অনেক কাজ করতে হত তাঁর সাথে। হঠাৎ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন আমি এই সেবা সমিতির ভার নেই এবং অনেক দিন পরিচালনা করি। আর একজন মুসলমান মাস্টার সাহেবের কাছেই টাকা পয়সা জমা রাখা হত। তিনি সভাপতি ছিলেন আর আমি ছিলাম সম্পাদক। যদি কোন মুসলমান চাউল না দিত আমার দলবল নিয়ে তার উপর জোর করতাম।" এভাবে তিনি সামাজিক

আদর্শের জায়গা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজের জীবনে।

বঙ্গবন্ধু পরিণত বয়সে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠার সময় থেকে তাঁর গণমানুষকে 'দুঃখী মানুষ' হিসেবে তাঁর বক্তৃতায় বিবৃতিতে উল্লেখ করতেন। তাঁদের কথা তিনি সবসময় চিন্তা করতেন। স্বাধীনতার পরে তিনি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান হন। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা উপলক্ষে তিনি বেতার-টেলিভিশনে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে উল্লেখ করেন : "আমার প্রিয় দেশবাসী, বিগত পঁচিশ বছর ধরে আপনারা ক্ষুধা, বঞ্চনা, অশিক্ষা এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষকেরা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটা নিকৃষ্টতম উপনিবেশে পরিণত করেছিল। দুঃসহ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। পিষ্ট হচ্ছিলাম শোষণের জগদ্দল পাথরের নিচে চাপা পড়ে। দারিদ্র্যের ও অনাহারের বিষবাষ্পে যখন আমরা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন তদানীন্তন পাকিস্তানী শাসকরা আমাদের কষ্টার্জিত তিন হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুটে নিয়ে তাদের পশ্চিম পাকিস্তানকে গড়ে তোলার কাজে মত্ত ছিল। ন্যায়বিচার দাবী করায় মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ আমাদের উপর নেমে এসেছিল। সমসাময়িককালে নিষ্ঠুরতম স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে, আর তিন কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত। এসব কিছুই ঘটেছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। আজ আমি যখন আমার সোনার বাংলার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ধূসর পাণ্ডুর জমি, ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম, ক্ষুধার্ত শিশু, বিবস্ত্র নারী আর হতাশাগ্রস্ত পুরুষ। আমি শুনতে পাই সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ, নির্যাতিত নারীর ক্রন্দন ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ফরিয়াদ। আমাদের স্বাধীনতা যদি এদেরকে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ধার করে এদের মুখে হাসি ফোটাতে না পারে, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত শিশুর মুখে তুলে দিতে না পারে এক মুষ্টি অন্ন, মুছে দিতে না পারে মায়ের অশ্রু ও বোনের বেদনা, তা'হলে সে স্বাধীনতা মিথ্যা, সে আত্মত্যাগ বৃথা। আমাদের এই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার বর্ষপূর্তি উৎসবের লগ্নে দাঁড়িয়ে, আসুন আজ আমরা এই শপথ গ্রহণ করি, বিধ্বস্ত মুক্ত বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী নয়, সাড়ে সাত কোটি মানুষ তার ফল ভোগ করবে। আমি ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখী ও উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর 'অনার্জিত রয়ে গেছে স্বপ্নপূরণ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন : '১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর আমার আব্বা যদি ইচ্ছে করতেন ইয়াহিয়ার অধীনে প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। আর আমরা পিন্ডি থেকে বিআইএ-র বিমানে এসে ঢাকায় পা দিতে পারতাম। হয়তো একদিন এই মাটির মানুষগুলোকে দেখতাম করুণার চোখে। কিন্তু আমার আব্বা কখনো যেনতেন

প্রকারে ক্ষমতায় যাবার রাজনীতি করেননি, বারবার চেয়েছেন এদেশের মানুষের অধিকার।'

শোষণহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর দুঃখী মানুষদের ন্যায্য মজুরির চিন্তা করতেন। ১৯৭২ সালের ১লা মে বঙ্গবন্ধু মে দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন- "আমার প্রিয় শ্রমজীবী ভাই ও বোনেরা, স্বাধীন বাংলার মুক্ত মাটিতে এবারই সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক মে দিবস পালিত হচ্ছে। ...... আপনারা অতীতে বার বার আমার ডাকে সাড়া দিয়ে নির্ভীক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও আপনারা আমার আহ্বানে মনে-প্রাণে এগিয়ে আসবেন। অতীতে আমরা একটি মর্মান্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম। গুটিকয়েক সুবিধাবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জাতীয় সম্পদ ও শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিল। দেশ আজ স্বাধীন। সম্পদের মালিক জনগণ। তাই কোন শ্রেণীবিশেষের ভোগ-লালসার জন্য এবং লোভ চরিতার্থ করার নিমিত্ত এই সম্পদকে অপচয় করতে দেয়া হবে না। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র কায়েম করা। এই ব্যবস্থায় দেশের সমুদয় উৎপাদিত ও প্রাকৃতিক সম্পদ কৃষক-শ্রমিক ও সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা হবে। যদিও বাধা অনেক, সমস্যার শেষ নেই, তবুও লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।"

বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ থেকে বোঝা যায় তিনি শ্রেণী বৈষম্যের অবসান চেয়েছিলেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতি শ্রমজীবী মানুষদের শোষণ করে এবং এর ফলে সামাজিক আদর্শ গড়ে ওঠে না। শোসক- শোসিকের বঞ্চনায় বৈষম্যের সমাজ তৈরি হয়। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে চারটি মূলনীতির উল্লেখ রেখেছিলেন। সেগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তিনি কাল মার্ক্সের তাত্ত্বিক মূল্যায়ন থেকে সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করেননি। পাকিস্তান আমলের তেইশ বছরের শোষণ-বঞ্চনা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এটি ছিল সেই মূল্যায়নের বড় দিক। সেজন্য তিনি ১লা মে'র ভাষণে আরও উল্লেখ করেন : "আমার গরীব শ্রমিক ভাই ও বোনেরা, আপনারা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমের উপযোগী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুন। আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে, উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। দেশের সম্পদ বাড়িয়ে আমরা জীবনযাত্রার প্রকৃত মান উন্নয়ন করতে সফল হব। আজকের এই মে দিবসে আসুন আমরা এই শপথ গ্রহণ করি যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য আমরা অবিরাম সংগ্রাম করে যাব।"

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ 'বঙ্গবন্ধু : আমার রাজনীতি ও সংসদ' প্রবন্ধে

উল্লেখ করেছেন : ‘সংসদে আরও একটা বিষয় প্রায়ই লক্ষ্য করতাম, পার্লামেন্টে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে স্পিকার বিব্রত হতেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু হতেন না। উদার না হলে, গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন না হলে এটা ভাবাই যেত না। ১৯৭৩ সালে পার্লামেন্টে আতাউর রহমান খান, এমএন লারমাসহ বিরোধী দলের কয়েকজন এমপি ছিলেন। তখনো দেখেছি তারা কথা বলতে চাইলেই সুযোগ পেতেন। প্রায় সময় বঙ্গবন্ধুই স্পিকারকে বলে সে সুযোগ করে দিতেন। বিরোধী দলের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আলাদা একটা মনোযোগ ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের যত অমিলই থাকুক না কেন বঙ্গবন্ধু কখনো বিরোধী দলের নেতাদের কটাক্ষ করে কিছু বলতেন না বরং তাদেরকে যথাযথ সম্মান দিয়ে কথা বলতেন। রাজনৈতিক শিষ্টাচার তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।’

বঙ্গবন্ধু চীনে গিয়েছিলেন শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে। তিনি ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে লিখেছেন : “আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতির যতদিন দুনিয়ার থাকবে ততদিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর।”

পাকিস্তান আমলের শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং দুঃখী মানুষের প্রতি প্রবল ভালোবাসা ও দায়িত্বের টানে তিনি সমাজতন্ত্রে আস্থা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তেমন একটি সামাজিক আদর্শ তৈরি করার সুযোগ তিনি পাননি। বিশ্বাসঘাতক কুচক্রীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে।

সামাজিক আদর্শে নারী-পুরুষের সমতার জায়গাটি তিনি মূল্যায়ন করেছেন নিজের সচেতন বোধে। নারী সমাজকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবার লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লিখিত হয়েছে : “জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।” স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি তাঁদেরকে ‘বীরাঙ্গনা’ খেতাবে ভূষিত করেন। বীরাঙ্গনা অর্থ বীর নারী সে সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের যে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছিল সেখানে লেখা ছিল ‘বীর/ বীরাঙ্গনা সৈনিক’। সার্টিফিকেটে ছেলেদের নামের সঙ্গে ‘বীর’ রাখা হয়েছে, মেয়েদের নামের সঙ্গে ‘বীরাঙ্গনা’ রাখা হয়েছে। তবে সৈনিক শব্দটি কোনো সার্টিফিকেটে কাটা হয়নি। নারীকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মর্যাদা দিয়ে তিনি সামাজিক আদর্শের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ নারীর এই স্বীকৃতির মর্যাদা দেয়নি। নারী প্রবল অবমাননার ভেতর দিনযাপন করেছে। বঙ্গবন্ধু মেয়েদের প্রশিক্ষণের এবং চাকরির ব্যবস্থা

গ্রহণ করলে অনেক মেয়ের বাবা দরখাস্তে পিতা হিসেবে নিজের নাম লেখার অনুমতি দেয়নি। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, কোনো বাবা তার নাম লিখতে না দিলে বাবার নামের জায়গায় আমার নাম লিখে দিও। এভাবে তিনি সামাজিক আদর্শের জায়গা সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধের অভাবের কারণে নারী মর্যাদার আসন পায়নি। নিপীড়িত-অবহেলিত জীবনযাপন করেছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে। পুরো সমাজ যদি মানুষের মর্যাদার বিষয়ে তৈরি না থাকে তবে এভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। সেজন্য সামাজিক আদর্শ গড়ে তোলা সরকার প্রধানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু সামাজিক আদর্শের দিকটি মানুষের সামনে উপস্থাপন করার পরও মানুষ অপরিশীলিত মূল্যবোধের কারণে সামাজিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। নারীর জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিল। মানুষ স্বাধীনতার দিগন্তে নারীকে মহীয়ান করতে পারেনি। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সামাজিক আদর্শের মূল্যবোধ। মানুষ বুঝতে চায়নি যে নারী-পুরুষের সমতার জায়গা মানবজনমের ধারাবাহিকতার মূল স্রোত।

বঙ্গবন্ধু তাঁর "আমার দেখা নয়াচীন" গ্রন্থে জমি লাভের ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমতার জায়গার কথা উল্লেখ করেন : ''নয়াচীনে একখণ্ড জমি দেখলাম না, যা অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। রেল লাইনের পাশে যে গর্তগুলি পড়ে থাকে সেগুলিতেও ফসল করা হয়েছে। যদি কোনো জমি ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে থাকে তাহলে সরকার কঠোর শাস্তি দেয়। জমি যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; স্বামী জমি যাহা পাবে, স্ত্রীও সমপরিমাণ জমি পাবে এবং দুজনকেই পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, দুজনই জমির মালিক। স্বামী কাজ করবে আর স্ত্রী বসে খাবে এ প্রথা চীনের থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি ট্রেন থেকে পুরুষ ও মেয়েলোক অনেককেই হাল-চাষ করতে দেখেছি।"

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষিত সমাজ গঠনে তিনি সুদুরপ্রসারী লক্ষ্যমাত্রায় নিয়োজিত হন। ১১ হাজার প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ করেন। প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা যেন অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করে এটা ছিল লক্ষ্য। দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষায় গড়ে তোলা সামাজিক আদর্শের বড় দিক। বঙ্গবন্ধু এখানে তাঁর সরকার প্রধানের দায়িত্ব অটল রেখেছিলেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সবসময় সোচ্চার ছিলেন। দুর্নীতি সামাজিক আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ পরস্পরের সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীই সমাজ। সুতরাং সামাজিক আদর্শের চিন্তা ছিল বঙ্গবন্ধুর দার্শনিক

ভাবনার বড় দিক। তিনি 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছে : "এক জায়গায় এক ঘটনা শুনলাম, এক সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়েছিল, তাকে জনসাধারণ ধরাইয়া দেয়। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। সেই হতে কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেউই ঘুষ খেতে সাহস পায় না।"

পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি প্রবল থাকলে দেশ প্রাকৃতিক কারণে দুর্দশাগ্রস্ত হয় না। মানুষ সেটা অনায়াসে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "চীন বহু বড় দেশ, সমস্ত দেশটায় চাষাবাদ হতে পারে। সরকার জনগণের সাহায্য নিয়ে হাজামজা নদী, খাল কাটতে শুরু করেছে। প্রত্যেক বৎসর বন্যায় লক্ষ একর জমির ফসল পূর্বে নষ্ট হয়ে যেত; আজ আর সাধারণ বর্ষায় ফসল নষ্ট হতে পারে না। একমাত্র হোয়াংহো নদীতে বন্যায় বৎসরে লক্ষ লক্ষ একর ফসল নষ্ট হতো। সরকার হোয়াংহো নদীতে বাঁধ বাঁধবে বলে জনগণকে ডাক দিলো। লক্ষ লক্ষ লোক পেটে খেয়ে সরকারকে সাহায্য করলো। হোয়াংহোকে বলা হয় চীনের দুঃখ। চীনারা আগে কোনোদিন এই বাঁধ বেঁধে রাখতে পারে নাই। কিন্তু বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছে। এখন আর হোয়াংহো নদীতে বন্যা হতে পারে না।"

নিজের রাজনীতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের এই মিল তিনি নিজ দর্শনে লালন করেছেন। বইজুড়ে অনেক উদ্ধৃতি আছে। যা উল্লেখ করা যায়। ৪ঠা আগষ্ট ১৯৬৬ তারিখে 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "রেনু কিছু খাবার দিয়ে গেছে-কি করে একলা খেতে পারি? কই মাছ খেতে আমি ভালবাসতাম, তাই ভেজে দিয়েছে। কয়েকটা মাছ পাকিয়ে দিয়েছে, মুরগির রোস্ট, এগুলি খাবে কে? কিছু কিছু খেয়ে বিলিয়ে দিলাম কয়েদিদের মধ্যে। তারা কত খুশি এই জিনিস খেয়ে। কেহ বলে, সাত বৎসর কেহ বা পাঁচ বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর এই জেলে একঘেয়ে খাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে।"

একই বইয়ে এই প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করেছেন : "আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম। জেলখানায় আমার জন্য কাজ করবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার সাথে এক পাক হবে না! আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখনও জমিদার তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ যখন সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের

শোষণের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।”

বঙ্গবন্ধু এভাবে মানুষের অধিকারের জায়গা মূল্যায়ণ করেছেন। মানুষকে শোষণের বঞ্চনাকে তিনি ‘ভয়াবহ’ শব্দ দিয়ে যাচাই করেছেন। দুঃখী মানুষের এই বঞ্চনা তাঁর মানবিক চিন্তার কাছে ধিকৃত হয়েছে। এভাবে তিনি মানুষকে দেখেছেন আপন বোধের আলোয়। ড. নীলিমা ইব্রাহিম তাঁর ‘শেখ মুজিব - একটি সংগ্রাম একটি অনন্য ব্যক্তিত্ব’ প্রবন্ধে লিখেছেন : ‘এই বজ্রকণ্ঠের ব্যক্তিত্বের অপর দিকে দেখেছি কুসুমের কোমলতা, সেখানে জাতির নায়ক নেই, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নেই, আছেন সকলের সদালাপী, মিষ্টভাষী স্নেহবৎসল মুজিব ভাই, মুজিব ভাই সবার আপন, সেখানে ছোট-বড় ভেদাভেদ নেই, নেই ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত মূর্খের ব্যবধান।’

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবন দর্শনের আলোকে মানুষের অধিকারের কথা নিজে অবলীলায় উচ্চারণ করেন : “আমার মতে, ভাত-কাপড় পাবার ও আদায় করে নেবার অধিকার মানুষের থাকবে, সাথে সাথে নিজের মতবাদ প্রচার করার অধিকারও মানুষের থাকা চাই। তা না হলে মানুষের জীবন বোধ হয় পাথরের মতো শুষ্ক হয়ে যায়।”

এই আদর্শগত ভিত্তি থেকে তিনি জাতির পিতা। বাঙালির স্বপ্নদ্রষ্টা। জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ‘জননায়কের আবির্ভাব ও তিরোধান’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয় অনেক সময় ধরে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের হৃদয় থেকে তাঁকে অপসারণ করা যায়নি।’

বঙ্গবন্ধু বাঙালির ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

তথ্যসূত্র :

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১২

২. কারোগারের রোজনামচা
শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৭

৩. আমার দেখা নয়াচীন
শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০২০

৪. শেখ হাসিনা রচনা সমগ্র-১

মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০

৫. দৈনিক সমকাল, ৭.৪.২০১৬
মোঃ আবদুল হামিদ

৬. ধন্য সেই পুরুষ
বেতার বাংলা সংকলন, বেতার প্রকাশনা দপ্তর, জুন ২০০০

৭. জননায়কের আবির্ভাব ও তিরোভাব
আনিসুজ্জামান দেশ পত্রিকা, কলকাতা, ১৭ মার্চ ২০১৯

শিক্ষকের মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু

সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধুকে তিনবার কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমবার দেখি ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। বাংলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন একুশের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে। সেদিন তাঁকে সামনাসামনি দেখি। এর আগে দেখার সুযোগ পাইনি। কারণ, আমার বাবার চাকরিসূত্রে আমার শিক্ষা জীবনের পুরো সময় কেটেছে রাজশাহী শহরে। ১৯৬৮ সালে এম.এ পাশ করার পরে আমি ১৯৬৯ সালে ঢাকা শহরে আসি। তখন পর্যন্ত ঢাকা আমার কাছে একটি অচেনা শহর। পত্রিকার পাতায় চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দরখাস্ত জমা দেই। ইন্টারভিউর চিঠি পাই পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে কলেজের চাকরির জন্য এবং বাংলা একাডেমি থেকে। দুটো চাকরিই আমার হয়। কলেজের চাকরিতে আমার পোস্টিং হয় সিলেটের এম.সি কলেজে। আমি অত দূরে চাকরি করতে যাইনি। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে বাংলা একাডেমির চাকরিতে যোগদান করি। ঢাকা কলেজের ভোট কেন্দ্রে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ভোট দিয়েছিলাম ১৯৭০ সালের নির্বাচনে।

বঙ্গবন্ধু তখন বাঙালির নির্বাচিত নেতা। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করেছে ইয়াহিয়া খানসহ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তাদের বিরোধিতার মুখে বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় অবস্থান গভীর মর্যাদার সঙ্গে অনুধাবন করেছি।

সেসময় বাংলা একাডেমির পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। তিনি একুশের বইমেলা উদ্বোধন করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন এই প্রত্যাশায় উপস্থিত দর্শক উদগ্রীব হয়েছিল।

সেদিন বাংলা একাডেমির অনুষ্ঠান হচ্ছিল বটমূলে। আমরা দুই-তিন শ লোক দর্শক সারিতে বসে আছি। বিদেশি যারা বাংলা ভাষা শিখেছেন, তাদের হাতে সনদপত্র তুলে দিলেন বঙ্গবন্ধু। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি পর্যায়ে দেখলাম, কেউ একজন বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে কানে কানে কিছু একটা বললেন। প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁকে ক্রুদ্ধ দেখাল। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে উঠলেন না। দর্শক সারিতে বসেছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী হুসনা বানু খানম। বঙ্গবন্ধু তাঁকে মঞ্চে এসে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে অনুরোধ করলেন। শিল্পী জানতে চাইলেন কোন গান গাইব। বঙ্গবন্ধু বললেন, ‘ও আমার দেশের মাটি

তোমার পরে ঠেকাই মাথা।' গান শেষে তিনি ভাষণ দিলেন, কিন্তু ভাষণে তিনি ক্ষুব্ধ হওয়া সম্পর্কে কিছুই বললেন না। তিনি তাঁর ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, '১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষার আন্দোলন ছিল না; বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন এর সাথে জড়িত ছিল। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি ঘোষণা করছি, আমার দল ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই সকল সরকারি অফিস-আদালত ও জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা চালু করবে। এ ব্যাপারে আমরা পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করব না। কারণ, তাহলে সর্বক্ষেত্রে কোনদিনই বাংলা চালু করা সম্ভবপর হবে না। এ অবস্থায় হয়ত কিছু কিছু ভুল হবে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এভাবেই অগ্রসর হতে হবে।' দুই দিন পর জানা গেল, ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর সঙ্গে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভুট্টো আসবেন না বলে বৈঠকটি স্থগিত হয়ে গেছে-সে বার্তাটি সেদিন তখন তাঁকে জানানো হয়েছিল।

একজন সাহিত্যকর্মী হিসেবে এটা আমার জন্য একটি অসাধারণ শিক্ষা। একজন রাজনৈতিক নেতা কীভাবে সঙ্গীতের বাণী এসং সুরের মাধ্যমে নিজের উত্তেজনার জায়গা প্রশমিত করলেন এবং মানুষকে দেশপ্রেমের জায়গায় অনুপ্রাণিত করলেন। সেদিন তিনি উত্তেজিত হলে বাংলা একাডেমি থেকেই একটি বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে যেত, কিন্তু তিনি সেটা করলেন না। একজন বলিষ্ঠ নেতা যেভাবে সংস্কৃতিকে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের দেশপ্রেমকে অনুপ্রণিত করলেন, তা থেকে এই শিক্ষা লাভ করলাম; এবং প্রথম দর্শনেই তাঁকে একজন শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করলাম। তিনি যেভাবে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখালেন তা ভেবে এখনও আমি তাঁকে জীবন-শিক্ষক হিসেবে মেনে নেই। আরেকবার বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম ১৯৭২ সালে। সে সময় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন অধ্যাপক ড. মাজহারুল ইসলাম। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন। সেটি দিতে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নম্বরের বাড়িতে যাবেন। সঙ্গে নিলেন আমাদের, যাঁরা লেখালেখি করতাম। সেদিন খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলারও সুযোগ পাই। সেটি আমার জীবনের উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে রয়েছে।

তৃতীয়বার বঙ্গবন্ধুকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাই আবার বাংলা একাডেমিতে। ১৯৭৪ সালে আয়োজন করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। সেটি উদ্বোধনের জন্য বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন একাডেমির

মহাপরিচালক ও কয়েকজন সহকর্মী। তাঁদের কাছে শুনেছিলাম বঙ্গবন্ধু প্রথমে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'আমাদের প্রথিতযশা সাহিত্যিকরা থাকতে একটি সাহিত্য সম্মেলন আমি কেন উদ্বোধন করব। আমিতো শুধু রবীন্দ্রনাথ পড়ি।' মহাপরিচালক তাঁকে বললেন, এটি যেহেতু আন্তর্জাতিক সম্মেলন, প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলে মর্যাদা বাড়বে। আমরা আপনাকে চাই। আমরা জানি আপনি শিল্প-সংস্কৃতির মানুষ। তিনি রাজি হলেন।

সেই সম্মেলনে ভাষণ শুনলাম বঙ্গবন্ধুর। তিনি লেখকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আপনারা দুঃখী মানুষের আনন্দ-বেদনার সবটুকু আমাদের সাহিত্যে তুলে ধরেন। এটা আমাদের সাহিত্যের উপাদান হবে। এভাবে বাংলাদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। আমরা আমাদের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিয়ে যাব।'

আজকে যখন সেই সময়গুলো ফিরে দেখি তখন মনে হয়, বঙ্গবন্ধু যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো আমাদের শিল্প-সাহিত্যের অনেক বড় জায়গা তৈরি হতো। অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভিন্নমাত্রায় পৌঁছাতে পারত; যেভাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পৌঁছাতে পেরেছে। ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে দিবস দুইটি। আমাদের বাংলা ভাষার জন্য জীবনদান করা 'শহিদ দিবস' ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। অজস্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই ভাষা সংরক্ষণ করার অনুপ্রেরণায় এই দিবস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হবে। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ঐতিহ্যিক প্রামাণিক দলিল হিসেবে সংরক্ষণ করেছে। ইতিমধ্যে অনেক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই ভাষণ। এই ভাষণের একটি বাক্যে আমি বঙ্গবন্ধুকে শিক্ষকের মর্যাদায় পাই – 'আর দাবায়ে রাখতে পারবে না।' এই বাক্যে মানবাধিকার লজ্ঝিত না করার কঠিন উচ্চারণ। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ উপনিবেশের যাঁতাকলে পিষ্ট না হওয়ার জন্য বলবে 'আর দাবায়ে রাখতে পারবে না।' বিশ্বকে আমরা দুটি দিন উপহার দিতে পেরেছি। আরেকটি বিষয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে বাংলা সাহিত্যকে আর বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে মাতৃভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আমাদের গৌরবময় অর্জনগুলো দেখতে পাই। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির আরো অনেক কিছু অর্জিত হতো।

১৯৭৩ সালের একদিন বাংলা একাডেমি থেকে ফিরছিলাম। পাবলিক লাইব্রেরিতে একটা বইয়ের জন্য ঢুকেছিলাম। বই নিয়ে ফেরার সময় হাঁটতে

হাঁটতে শাহবাগের মোড় পর্যন্ত এসে রিকশার জন্য দাঁড়াই। এমন সময় দেখি প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি আসছে। আমি গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি। খেয়াল করি বঙ্গবন্ধু আমাকে দেখছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে সালাম জানাই। তিনিও তাঁর হাত কপালে ঠেকান। মুহূর্তে চলে যায় গাড়ি। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একজনের সালামের উত্তর দিলেন। এটিও ছিল আমার কাছে শিক্ষার আর একটি দিক। বুঝতে পারি তিনিই সেই মানুষ যিনি সরকার প্রধান হয়েও পথচারীকে উপেক্ষা করেননা। এখন পর্যন্ত আমার কাছে এই স্মৃতি ভাস্বর হয়ে আছে।

এই দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পুরোটা সময় উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি তার কৈশোর থেকে তার চারপাশের যে দুঃখী মানুষের চেহারা দেখেছিলেন, তাদের জীবনের মুক্তির লক্ষ্য নিয়েই তিনি তার নিজের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিলেন। এ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায়।

ভারত উপমহাদেশের তিন একমাত্র রাজনৈতিক নেতা, যিনি একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের রাজনীতিকে বদলে দিয়েছিলেন। মানচিত্রে স্থান পেয়েছে আর একটি স্বাধীন দেশ। তার সঙ্গে ছিল তার রাজনৈতিক সহযোদ্ধারা এবং দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ফিরে আসেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে। সে দিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সে ভাষণে বলেছিলেন, '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দিন এবং আমার অন্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।' তার নিজের এই কথা থেকে বোঝা যায়, কীভাবে তিনি সামগ্রিক স্বার্থে এবং অগণিত মানুষের জীবনের জন্য নিজে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বড় দিক। এখানেও তিনি আমার সামনে রাজনীতির শিক্ষক। প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার দীক্ষা।

১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী পাকিস্তানের জেলখানা থেকে মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু। রেডক্রসের একটি বিশেষ বিমানে করে তাঁকে লন্ডনে পাঠানো হয়। তিনি ভোরবেলা লন্ডনে পৌঁছান। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন,

'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজি নই, আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' সেই দিনেই সে সময়ের বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর এ্যাডওয়ার্ড হীথের আগ্রহে বৃটেনের রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে তিনি দিল্লীতে আসেন। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান ভারতের সে সময়ের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বিমান বন্দরে দেয়া ভাষণে তিনি এক পর্যায়ে বলেছিলেন, 'আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে, তাতে যোগ দেয়ার জন্য আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।' এভাবেই তিনি সারাটা সময় দেশের গণমানুষের কথা ভেবেছেন। দেশ পরিচালনার কথা ভেবেছন। নিজের কথা, নিজের বাবা-মা, স্ত্রী, ছেলে- মেয়ের কথা নিজের বুকের ভেতর যে গভীরেই থাকুক না কেনো, তিনি মুখে সব সময় উচ্চারণ করেছেন তার দেশের দুঃখী মানুষের কথা। তিনি কখনোই জনগণ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। এখানেও তিনি আমার শিক্ষক।

১৯৭২ সালে যখন বিমানটি বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করেছিল তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলেন তাঁর জন্য। মানুষ প্লাবিত করেছিল শহরের রাস্তা। জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল গাড়িটি। বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছাতে তাঁর সময়ে লেগেছিল কয়েক ঘন্টা। রেসকোর্স ময়দানে দেয়া ভাষণে তিনি আবার বলেছিলেন, 'আজ সোনার বাংলার কোটি কোটি মানুষ গৃহহারা, আশ্রয়হারা। তারা নিঃসম্বল। আমি মানবতার খাতিরে বিশ্ববাসীর প্রতি আমার এই দুঃখী মানুষদের সাহায্য দানের জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। নেতা হিসেবে নয়, ভাই হিসেবে আমি আমার দেশবাসীকে বলছি আমাদের সাধারণ মানুষ যদি আশ্রয় না পায়, খাবার না পায়, যুবকরা যদি চাকরি বা কাজ না পায়, তাহলে আমাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়ে যাবে, পূর্ণ হবে না। আমাদের এখন তাই অনেক কাজ করতে হবে।'

স্বাধীন বাংলাদেশে পথপরিক্রমায় এখনও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে অনেকখানি বাকি রয়ে গেছ। যে দুঃখী মানুষের ভাবনা, তার মৌলিক চিন্তার অংশ- সেই জায়গাটি পূরণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধু জনগণের সেই নেতা, যিনি বারবার উল্লেখ করেছেন তাদের কথা। তিনি ১৯৭০ সালের ২৮শে অক্টোবর পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত ভাষণে বলেছিলেন, 'অর্থনীতির সর্বত্র মজুরি কাঠামো ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির গ্রাস থেকে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ও অল্প উপার্জনশীল ব্যক্তিদের বাঁচাবার জন্য দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা আনতে হবে।' আজকের দিনে

তাই বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু আর একবার এসে দাঁড়ান আপনার বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের পাশে।

করাচী মিয়ানওয়ালী কারাগারে নারীদের সংরক্ষিত ওয়ার্ডে তাকে আটক করে রাখা হয়। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরের দিন ছিল ৪ ডিসেম্বর। সেইদিন ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বঙ্গবন্ধুর বিচারকারী ট্রাইব্যুনাল সদস্যদের ডেকে পাঠান। তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রায় স্থগিত করা হয়। এর মধ্যে তাঁকে ভয় দেখানোর জন্য তাঁর সেলের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল। তিনি তাঁর দশই জানুয়ারির ভাষণে বলেছিলেন, 'আপনারা জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, আমার সেলের পাশে আমার জন্যে কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয়বাংলা।'

বঙ্গবন্ধু তাঁর অধিকাংশ ভাষণে নিজের জাতিসত্তা, নিজের দেশ, নিজের মাতৃভাষার বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনিই সেই মানুষ, যিনি জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছিলেন নিজের মাতৃভাষায়। বাংলা ভাষাকে একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার আগে সংবিধানে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ১৯৭১ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তাঁকে প্রদত্ত একটা সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন, 'সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে গণমানুষের সুখ-শান্তি ও স্বপ্ন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতি।' একটি জাতির জন্য তিনিই সেই নেতা যিনি বুঝেছিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কতটা জরুরী। এটাতো সত্যিই যে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা একটি জাতিকে মননে চেতনায় শানিত করে। যে জাতি নিজস্ব সাংস্কৃতিক বোধে দীপ্ত নয়, সে জাতি শিকড়হীন পরগাছা মাত্র। বাংলাদেশের অনেক অর্জনে নিজেদের সাংস্কৃতিক বোধকে সমুন্নত রাখতে পেরেছিল বলেই বাঙালি তার আত্মমর্যাদায় দরিদ্র নয়। প্রতিটি সংকটে-সংগ্রামে সাংস্কৃতিক বোধ দিয়ে এ জাতি তার সংকটের উত্তরণ ঘটিয়েছে।

আবার ফিরে আসি বঙ্গবন্ধুর দশই জানুয়ারির ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি......। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্য বাহিনী তখনই ফিরিয়ে নিবে।' আমরা জানি

কোন দেশ থেকে সাহয্যকারী সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়া কত কঠিন। বঙ্গবন্ধুর মত অসাধারণ ব্যক্তি সেদিন আমাদের সামনে ছিলেন বলেই বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের সেনাবাহিনী '৭২ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ থেকে চলে গিয়েছিল। নিজেদের সার্বভৌমত্বের দিকে তাকিয়ে একথা বলতেই হয় যে, বঙ্গবন্ধুর এই নানামুখী চিন্তা এই দেশ ও জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল মাত্র সাড়ে তিন বছর সময়ে।

সে দিনের ভাষণে তিনি আর একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বলেছিলেন, 'যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে তাদের অবশ্যই বিচার হবে। বাংলাদেশে এমন পরিবার খুব কমই আছে, যে পরিবারের লোক মারা যায়নি। আজকে দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ শুরু হচ্ছে। আমাদের গভীর বিশ্বাস এ বছর বিচারকাজ সম্পন্ন হবে এবং রায়ও কার্যকর হবে। যতদিন একটি দেশে অপরাধ টিকে থাকে ততদিন সে দেশের মানুষের মাথা অবনত থাকে। মানুষ চায় ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে নিজের মাথাকে সোজা করে রাখতে। আমাদের বিপুল অর্জন আছে। ব্যর্থতার জায়গাও কম নয়। তারপরও নিজেদের জন্য নিজেদেরকে বড় করে তোলার পক্ষে চেষ্টা নিরন্তর। আমরা এই নিরন্তর সাধনা থেকে বিচ্যুত হব না। এই প্রতিজ্ঞা আমাদের আগামী প্রজন্মের। এ প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগোতে চাইলে পিছু হটে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। মৌলবাদের উত্থান রহিত হলে যুদ্ধাপরাধী দেশ থেকে নির্মূল হবে।' সেদিনের ভাষণে তিনি এ প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি। আমরা মনে করি যুদ্ধাপরাধীর দায় বহন করার মত গ্লানি থেকে মুক্ত হবে এই জাতি।'

বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারির ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, হিন্দু, মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।' প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে এটি একটি বড় শিক্ষা। চেতনা সমৃদ্ধ করার দিকদর্শন। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি এমন ভাবনায় আলোকিত থাকেন তবে দেশে দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না। মৌলবাদের উত্থান ঘটবে না। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার দিন নিঃশেষ হবে। মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালনের পাশাপাশি অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে। সব ধর্মের অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়ে প্রত্যেক ধর্মের মৌলিক সত্যকে নিজেরা বুঝবে। আমাদের সামনে এক অসাধারণ শিক্ষার বার্তা। আমি এই বার্তা

ধারণ করে শিক্ষক বঙ্গবন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকি।

বইপড়ার বিষয়টি বঙ্গবন্ধু যেভাবে দেখেছেন এটিও আমার জন্য শিক্ষার একটি দিক। সাধারণ মানুষ যদি কাজের অবসরে বই পড়েন তাহলে সামাজিক মূল্যবোধের একটি বড় জায়গা তৈরি হবে। পরিবারে বইপড়ার চর্চা থাকলে শিশুদের মাঝেও আগ্রহ তৈরি হবে। পড়ালেখার পাশাপাশি শিশুদের হাতে ওদের পছন্দের বই পড়তে দিলে ওদের মানসিক বিকাশ বড় পরিসরে গড়ে উঠবে। ও চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি যেভাবেই জীবন ধারণ করুক না কেন মানসিক বিকাশ গড়ে উঠবে ভিন্ন মাত্রায়। এর দ্বারা আমাদের সামাজিক অবক্ষয় রোধ হবে। মূল্যবোধের অভাব আমাদেরকে নিকৃষ্ট ধারণায় ফেলে দেবে না। বই পড়ার চিন্তা রেখে শিশুরা গড়ে উঠুক। আমরা সুন্দর সামাজিকতায় দিনযাপনের সুযোগ পাব। নারী ও শিশুদের প্রতি নানা ধরণের নির্যাতন আমাদের মর্মাহত করবে না। বঙ্গবন্ধুর এই শিক্ষা সামগ্রিকভাবে সমাজ বিনির্মানের বড় দিক।

বঙ্গবন্ধু নিজে লেখক ছিলেন। তিনটি বই রচনা করেছেন। এই তিনটি বইয়ে বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। ‘কারাগারের রোজনামচা’ বইয়ে লিখেছেন : ‘বন্ধু শহীদুল্লা কায়সারের ‘সংশপ্তক’ বইটি পড়তে শুরু করেছি। লাগছে ভালই, বাইরে পড়তে সময় পাই নাই।...রুমে বসে লেখাপড়া করা ছাড়া উপায় কি! তাই পড়লাম বইটা...।’ তিনি আর এক জায়গায় লিখছেন : ‘আজ আর খবরের কাগজ আসবে না। মিলাদুন্নবীর জন্য বন্ধ। দিন কাটানো খুবই কষ্টকর হবে। আমি তো একাকী আছি, বই আর কাগজই আমার বন্ধু। এর মধ্যেই আমি নিজকে ডুবাইয়া রাখি। পুরানা কয়েকটা ইত্তেফাক কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলাম।’ এই বইয়ে বঙ্গবন্ধুর পড়া বিদেশি বইয়েরও উল্লেখ আছে। তিনি এমন বইপ্রিয় মানুষ ছিলেন। এখানেও তাঁকে আমি শিক্ষক হিসেবে পাই। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনায় তিনি একজন প্রদীপ্ত মানুষ। তিনি আমাদের সামনে নেই, কিন্তু জীবন পরিচর্যা করার দিকদর্শন রেখে গেছেন। আমাদের দায়িত্ব স্বাধীন দেশের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে আমার যা করতে পারিনি, এই নৈরাজ্য যেন আমরা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি। আগামী পঞ্চাশ বছরে গড়ে উঠুক স্বাধীনতার স্থপতির স্বপ্নের বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধুর সব কথার মধ্যে শিক্ষার অন্তর্নিহিত বাণী গেঁথে আছে। শুধু রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নয় ব্যক্তি মানুষের জন্যও এই কথাগুলো শিক্ষার বড় দিক। শিল্প-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে মানুষের প্রতি অনুভবের মাত্রা বাড়ানোর এটি একটি দিক। এজন্য বঙ্গবন্ধুকে আমি জীবন-শিক্ষক মনে করি। বাংলা ভাষার একজন লেখক হিসেবে শিক্ষক বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণে রাখি। তিনি আমার সামনে গৌরব

অর্জনের নীতি নির্ধারক। শিক্ষকতার মানদণ্ডে তাঁর বিপুল পরিসর চেতনায় রাখি।

তথ্যসূত্র :

১. বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
সম্পাদনায় : মিজানুর রহমান মিজান
প্রকাশক : নভেল পাবলিকেশন্স
১৩৭, শান্তিনগর, ঢাকা

২. মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু ও বাংলা একাডেমি
পিয়াস মজিদ
প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, ২০২০

৩. কারাগারের রোজনামচা
প্রকাশক : বাংলা একাডেমি ২০১৭

নারী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা

সেলিনা হোসেন

শৈশব-কৈশোর থেকে বঙ্গবন্ধু যে সচেতন বোধ নিয়ে বড় হয়েছেন তা ছিল তাঁর নিজস্ব জগত। এ জীবনযাপন করার সময়ে তিনি মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষকে দেখেছেন। পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য দিয়ে তিনি কখনো মানবিক ভাবনাকে ক্ষুন্ন করেননি। নারী-পুরুষকে সামাজিক মর্যাদার জায়গা থেকে আলাদা করে দেখেননি। যদিও তাঁর চারপাশে নারীর প্রতি বৈষম্য ছিল চূড়ান্ত।

চাচাতো বোন ফজিলাতুন্নেছা রেণুর সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে বাল্য বয়সে বিয়ে হয়। আজীবন রেণুকে তিনি স্ত্রীর পারিবারিক সম্পর্কে দেখেননি। তিনি রেণুকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বড় পরিসরে দেখেছিলেন। পরিবারের ঊর্ধ্বে তাঁর রাজনীতির যাত্রায়ও রেণু একজন অসাধারণ সঙ্গী হিসেবে ছিলেন। এভাবে নারীর অবদানকে তিনি কখনো অবমূল্যায়ন করেননি। তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের সূচনায় তিনি উল্লেখ করেন এই বই লেখার জন্য রেণু তাঁকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। লিখেছেন : 'আমার স্ত্রী যার ডাক নাম রেণু- আমাকে কয়েকটা খাতাও কিনে জেলগেটে জমা দিয়ে গিয়েছিল। জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি পরীক্ষা

করে খাতা কয়টা আমাকে দিয়েছেন। রেণু আরও একদিন জেলগেটে বসে আমাকে অনুরোধ করেছিল। তাই আজ লিখতে শুরু করলাম।'

বইয়ের ৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : ''একটা ঘটনা লেখা দরকার, নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার তের বছর হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাবার পরে ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। কারণ, আমি সমস্ত সম্পত্তি ওদের দুই বোনকে লিখে দিয়ে যাব।' রেণুর দাদা আমার আব্বার চাচা। মুরুব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে। তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধহয় তিন বছর হবে।''

বঙ্গবন্ধুর এসব উদ্বৃতি থেকে বোঝ যায় নারীকে তিনি বিচ্ছিন্নভাবে দেখেননি, সমাজ-ভাবনার আলোকিত মানুষ হিসেবেই দেখেছেন। এখানেই নিহিত আছে নারী উন্নয়ন ভাবনার মৌলিক চেতনা। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনদর্শনে নারী-পুরুষের সমতার সত্যকে ধারণ করেছিলেন। নারীকে অবদমন করা তাঁর সামগ্রিক জীবনের কোথাও প্রতিফলিত হয়নি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমাজ পাটাতনে জেন্ডারের তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে মানবিক বোধ ধারণ করেছিলেন।

কৈশোর থেকে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। একবার স্কুলে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, স্কুলের হোস্টেলের ফেটে যাওয়া ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। ছাত্রদের থাকার অসুবিধা হয়। এই ছাদ ঠিক করে দিতে হবে। দু'জন মন্ত্রী একজন ছাত্রের বলা অধিকারের কথা শুনেছিলেন। শেখ মুজিব ছিলেন ছাত্রদের প্রতিনিধি। মন্ত্রী তাঁদের অধিকারের দাবী পূরণ করে দিয়েছিলেন। এভাবে রাজনীতির সূত্রকে আপন চেতনায় ধারণ করে তিনি তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়েছিলেন রাজনীতির পথে। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রবলভাবে সংযুক্ত হন। মুখোমুখি হন পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক রাজনীতির। একই সঙ্গে তিনি একজন সাহসী নেতা হয়ে ওঠেন অন্যায়ের প্রতিবাদে, অধিকার আদায়ের সাহসে, গণমানুষের মানবিক চেতনা সমুন্নত রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষায়।

এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করছি। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'ফেব্রুয়ারি ৮ই হবে, ১৯৪৮ সালে। করাচিতে পাকিস্তান সংবিধান সভার (কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলি) বৈঠক হচ্ছিল। সেখানে রাষ্ট্রভাষা কি হবে সেই বিষয়েও আলোচনা চলছিল। মুসলিম লীগ নেতারা উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী। পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লীগ সদস্যের সেই মত। কুমিল্লার কংগ্রেস সদস্য বাবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত দাবি করলেন বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক।' বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠল। আন্দোলনের জন্য কমিটি গঠিত হলো। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হলো। এইদিন ভোরবেলা শিক্ষার্থীরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পিকেটিং শুরু করে। বঙ্গবন্ধু নিজেও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'বহু ছাত্র গ্রেফতার ও জখম হল। কিছু সংখ্যক ছাত্রকে গাড়ি করে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে আসল। কয়েকজন ছাত্রীও মার খেয়েছিল। .... আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ঢাকার জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম।'

জেলে থাকার সময় তিনি লিখেছেন : 'যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে

উঠে স্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করত। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই,' 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই,' 'পুলিশি জুলুম চলবে না'- নানা ধরনের স্লোগান। এই সময় শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, ''হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।'' হক সাহেব আমাকে বললেন, ''তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।'' দৃষ্টান্তটি এজন্য যে বালিকাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বঙ্গবন্ধু আন্তরিকতার সঙ্গে মূল্যায়ন করেছেন। নারীর সমতার জায়গা তিনি নেতিবাচক অর্থে দেখেননি।

রাজনীতির সূচনাতে যারা রাজনীতি সচেতন হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি তাঁদের সংযুক্ত করেছিলেন দলের বিভিন্ন পদে। যেন তাঁরা সঠিকভাবে সঠিক কাজটি করতে পারেন। রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় হওয়ার জায়গাটি তৈরি করার জন্য ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে মুসলিমদের সংরক্ষিত আসনে আওয়ামী লীগের ৭ জন নারীকে মনোনয়ন দেয়া হলে ৭ জনই জয়ী হন। দ্বি-জাতিতত্ত্বের আলোকে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে মুসলিম নারীদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার বঞ্চিত করা হয়নি। আরও অনেকে যেমন আমেনা বেগম, মমতাজ বেগম, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীনসহ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রাজনীতি করেছেন। নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নারীকে রাজনীতি সচেতন করে তোলার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে নারীর ভূমিকা ছিল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা। পাশাপাশি রাজনীতির সচেতনতায় দেশবাসী যেন সরকারের সব ধরণের শোষণ ও বৈষম্যযুক্ত আচরণের ক্ষেত্রে প্রতিবাদী হতে পারে, এটিও ছিল মানুষকে তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ। একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল এই চেতনা লালনের ধারাবাহিকতা।

বদরুন্নেসা আহমদের নাম উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তিনি শিক্ষার্থী হিসেবে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তখনও তাঁর পাড়ালেখা শেষ হয়নি। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন । ১৯৫৪ সালে ৯২(ক) ধারা ও ১৪৪ ধারা ভাঙার অপরাধে জেল খেটেছেন।

আরও অনেক নারী আছেন যাদেরকে বঙ্গবন্ধু রাজনীতির ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়ার আগে আমেনা বেগমকে দলের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। কোনো কোনো প্রবীন নেতা নারীকে মনোনয়ন দেয়ার কারণে আপত্তি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁদেরকে বলেছিলেন, 'নারীদেরও পুরুষের মতো সমান অধিকার রয়েছে এবং তা রাজনীতির ক্ষেত্রেও। নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা দরকার।' এই গভীর বোধ থেকে বঙ্গবন্ধুর নারী উন্নয়ন ভাবনা তাঁকে নারীর অধিকার সংবিধানে প্রতিষ্ঠিত করার মৌলিক দায় দিয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে বঙ্গবন্ধুর নারীর উন্নয়ন ভাবনায় আলোকিত হয়েছেন নারী রাজনীতিবিদরা যেমন, তেমন সমাজের অন্যক্ষেত্রে কাজ করা নারীরাও। সেজন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন। নূরজাহান মুরশিদ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ আসনে জয়লাভ করেন। এরপর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এভাবে বঙ্গবন্ধু নারীকে তার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে তাদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়েছেন। নিজেদের মননশীলতা চর্চার সুযোগ দিয়েছেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনেও নূরজাহান মুরশিদ সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। তিনি তাঁর 'আমার কিছু স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন : 'বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য আমি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন- বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, লক্ষ্মৌ ভ্রমণ করলাম ও বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের পক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখলাম। দিল্লিতে আমি তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভি. ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, স্পিকার বীলন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজ্জীবন রাম ও বিরোধী দলের নেতা ফখরুদ্দীন আলী আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। দিল্লি পার্লামেন্টের উভয় হাউসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতাদান করি।'

বেগম সাজেদা চৌধুরীও মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবলভাবে সক্রিয় ছিলেন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'গোবরা নার্সিং ক্যাম্প'এর পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির শিক্ষা এমন ছিল যে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানেও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নারীরা তাদের দায়িত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতারের নারী শিল্পীরাও সঙ্গীতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে দৃঢ় পদক্ষেপে এলাকায় এলাকায় ঘুরেছেন। গণমানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। যারা পেরেছেন তাদের অনেকে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রধান হিসেবে নারী উন্নয়নের ভাবনাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যুক্ত করেন। মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীর পুনর্বাসনের জন্য 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারীর ক্ষমতায়নের মূল সূত্র সন্নিবেশিত হয়। বঙ্গবন্ধু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন ১৯৭৩-১৯৭৮ সালে। এখানে স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের বিষয়টি গুরুত্ব

লাভ করে। ১৯৭৩ সালে মন্ত্রীসভায় দু'জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের সূচনা ধরে প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নারী বিষয়ক বিভিন্ন ধারা। যেমন: সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে আছে 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি'। এই অংশের ১০ নম্বর ধারায় আছে 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে আছে 'মৌলিক অধিকার'। এই অংশের ২৭ নম্বর ধারায় আছে : 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'

২৮ ধারার ১ নম্বরে আছে : 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।'

এই ধারার ২ নম্বরে আছে : 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

এই ধারার ৪ নম্বরে আছে : 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

২৯ ধারার ১ নম্বরে আছে : 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।'

এই ধারার ২ নম্বরে আছে : 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'

এই ধারার ৩ নম্বরের গ অংশে আছে : 'যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সংবিধানের পঞ্চম ভাগের বিষয় 'আইনসভা'। এই বিষয়ের '১ম পরিচ্ছেদ-সংসদ'।

এই পরিচ্ছদের ৩ নম্বর ধারায় আছে : ‘সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।’

এই সংবিধানের নীতি মেনে নারীর ক্ষমতায়নের মর্যাদা প্রদানের বিভিন্ন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ১৯৭২ সালেই সুযোগ বাড়ানোর জন্য সরকারি চাকরিক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করেন।

বিশ্বজুড়ে সব দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধান রাষ্ট্রশাসনের অত্যাবশকীয় মূলনীতি। বঙ্গবন্ধু তাঁর অসাধারণ জীবন-দর্শনের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে নারী-পুরুষের সমতার জায়গায় কোনো ঘাটতি রাখেননি। এই দর্শনের আলোকে সামাজিক সমতার সৃষ্টিতে সব মানুষের ভূমিকা রাখার দায় নিতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে লক্ষ লক্ষ নারী পাকবাহিনীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু এই নারীদের অবস্থা জেনে মর্মাহত হন। কারণ বিজয় দিবসের পর থেকেই এই নারীরা পরিবারিক-সামাজিক অমানবিক- অপরিশীলিত মূল্যবোধের সামনে মানসিক নির্যাতন এবং অপমানের শিকার হন। শত্রুপক্ষ যুদ্ধকৌশল হিসেবে নারীদের নির্যাতন করে। বিশ্বজুড়ে এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজ আমাদের নারীদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। গর্ভবতী মেয়েটিকে বাবা-মা ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। নির্যাতিত স্ত্রীকে স্বামী ঘরে রাখেনি। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে নারীদের উদ্ধার করার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে ১৮ ফেব্রুয়ারি ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন।

১৯৭২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাবনা জেলার বসন্তপুর গ্রামে গিয়েছিলেন। বন্যার ফলে যে বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল তার সংস্কার উদ্বোধন করেছিলেন সেদিন। মঞ্চে ওঠার সময় শুনলেন নারী কণ্ঠের কান্না জড়ানো শব্দ। ২০-২৫ জন নির্যাতিত নারী এসেছেন বঙ্গবন্ধুর কাছে তাঁদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানানোর জন্য। ওদের কথা শুনে বঙ্গবন্ধু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আচ্ছা মা, বিষয়টি বিশেষভাবে আমি দেখব।’ পরমুহূর্তে মঞ্চে উঠলেন। তাঁর ভাষণের এক জায়গায় বললেন,

'আজ থেকে পাকবাহিনীর নির্যাতিত মহিলারা সাধারণ মহিলা নয়, তারা এখন থেকে বীরাঙ্গনা। মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে তাদের অবদান কম নয় বরং কয়েক ধাপ উপরে।' এই প্রসঙ্গে আরও বললেন, 'তাই তাদের বীরাঙ্গনার মর্যাদা দিতে হবে এবং যথারীতি সম্মান দেখাতে হবে। আর সেইসব স্বামী বা পিতাদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে, আপনারাও ধন্য। কেননা এ ধরনের ত্যাগী এবং মহৎ স্ত্রীর স্বামী বা পিতা হয়েছেন। তোমরা বীরাঙ্গনা তোমরা আমাদের মা।' সেদিন থেকে নির্যাতিত নারীরা 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত হন। যার অর্থ বীর নারী। মুক্তিযুদ্ধের পরে মুক্তিযোদ্ধাদের যে সনদপত্র দেয়া হয় সেই সনদপত্রটি দেখার সুযোগ হয় আমার। এখানে সেটির চিত্র তুলে দিলাম। এখানে লেখা হয়েছে 'বীর/ বীরাঙ্গনা সৈনিক'। বঙ্গবন্ধু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সৈনিক হিসেবে উল্লেখ করার মর্যাদা দিয়েছেন।

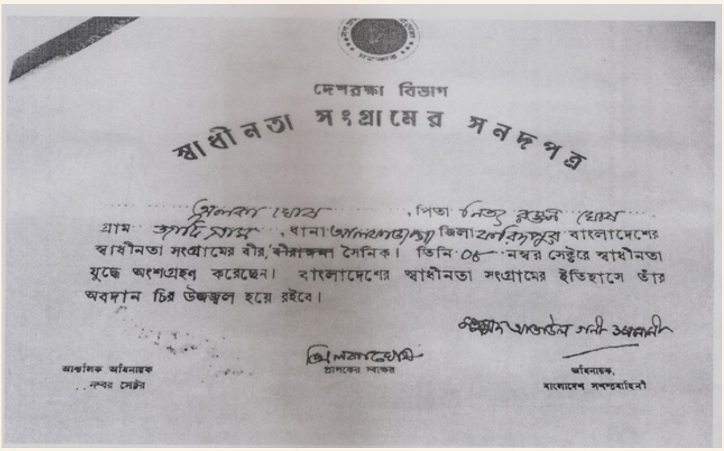
দেশরক্ষা বিভাগ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র

[illegible], পিতা [illegible] গ্রাম [illegible], থানা [illegible] জিলা [illegible] বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর,'বীরাঙ্গনা সৈনিক। তিনি ০৮ নম্বর সেক্টরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চির উজ্জ্বল হয়ে রইবে।

আঞ্চলিক অধিনায়ক
.. নম্বর সেক্টর

প্রাপকের স্বাক্ষর

অধিনায়ক,
বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী

বঙ্গবন্ধু সরকারের এই অবদান তাঁর স্বাধীনতার চেতনার মৌলিক বিশ্বাস। তিনি নারী-পুরুষকে সৈনিক হিসেবে উল্লেখ করার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এটি শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের একসূত্রে আবদ্ধ করা নয়। এটি হলো বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শনের মৌলিক চেতনা। নারীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ মাত্র নয়। এটি দেশবাসীর সামনে নারীর সম্মান। সবাই যেন বীর নারীদের গৌরবের জায়গা থেকে সম্মান করে।

'নারী পুনর্বাসন বোর্ড'-এর দ্বারা নির্যাতিত নারীদের কর্মে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের ট্রেনিং প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার বেইলি রোডে স্থাপন করা হয় 'উইমেন্স ক্যারিয়ার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট'। এখানে তাদের বিভিন্ন

ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। হস্তশিল্পসহ সেক্রেটারিয়েল কোর্স চলত।

১৯৭৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তরিত করে নারীদের পুনর্বাসন, শিক্ষা, কাজের সুযোগ ইত্যাদির পরিসর বাড়ানো হয়। এসব কাজের সূচনায় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব নিজ উদ্যোগে ১০ জন বীরাঙ্গনার বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সরকারের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি। শুধু নির্যাতিত নারী নয়, শহীদের স্ত্রী, মেয়েদের চাকরি এবং অন্যন্য আনুষ্ঠানিক বিষয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে চালু করা হয় নানা ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পরে গঠিত মন্ত্রীসভায় দু'জন নারীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন বদরুন্নেসা আহমদ এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ছিলেন নূরজাহান মুরশিদ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে দেশের সব প্রাইমারি স্কুল অবৈতনিক ঘোষণা করেন। মেয়েদের জন্য অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাও অবৈতনিক করা হয়। বঙ্গবন্ধু নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিকটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। তিনি শৈশব-কৈশোর থেকেই এই বোধে নিজস্ব ভাবনায় সজাগ ছিলেন। স্বাধীন দেশের সরকার গঠনের পরে তাঁর সচেতনতাকে দায়িত্বে উপনীত করে প্রশাসনিক দক্ষাতায় বদলে দেন দেশবাসীর ভাবনা। এ ব্যাপারে তিনি নারীর উন্নয়নে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। গঠিত হয় 'জাতীয় মহিলা সংস্থা।'

তাঁর এমন চিন্তায় গড়ে উঠেছিল স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বেতার ও টেলিভিশনের ভাষণের এক জায়গায় বলেছিলেন, 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব। ক্ষেত-খামার, কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলুন। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসবে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি।'

১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব নারী সম্মেলন। আন্তর্জাতিক নারী অধিকার আন্দোলনের মূলধারার বৈশ্বিক এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু সরকার নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকজন নারী এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের সুযোগ অবারিত করেছিলেন। অধিকারের জায়গা থেকে বঞ্চিত করেননি নারীদের। তাদের কাজের পরিসর বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁরা যেন বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। নারী উন্নয়ন ভাবনার পাশাপাশি তিনি দেশকে একই সমান্তরালে উন্নয়নের স্রোতে মিশিয়েছিলেন। তাঁর হাতে তৈরি হয়েছিল স্বাধীন দেশের দিক নির্দেশনা।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পরে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতা থেকে। যত্ন ও গভীর পরিচর্যায় কবির অসুস্থতার দিনগুলো স্বস্তি ও আরামের হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু জানতেন কবির অসাধারণ দুটো কবিতার লাইন – 'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' এভাবে একজন কবি নারীকে মহীয়ান করেছেন কবিতার ভাষায়। আর জাতির পিতা স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা নারীকে মহীয়ান করেছেন প্রশাসনের দ্বারা। তিনি সচেতনভাবে নারী-পুরুষের সমতার জায়গা নিজের দক্ষ প্রশাসনিক চিন্তায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসনে, খেলাধুলায় মেয়েশিশু-নারীর সমতার জায়গা সমন্বিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর হাতেই সামাজিক মূল্যবোধের অভাবে মেয়ে-শিশু, নারীর ধর্ষণের জায়গাটিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে। অপরাধী শাস্তি পেয়ে নিজেদের সংশোধন করবে এই প্রত্যাশা সকলের ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সবকিছু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বলতেই হবে বঙ্গবন্ধুর চেতনার ধারাবাহিকতা ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

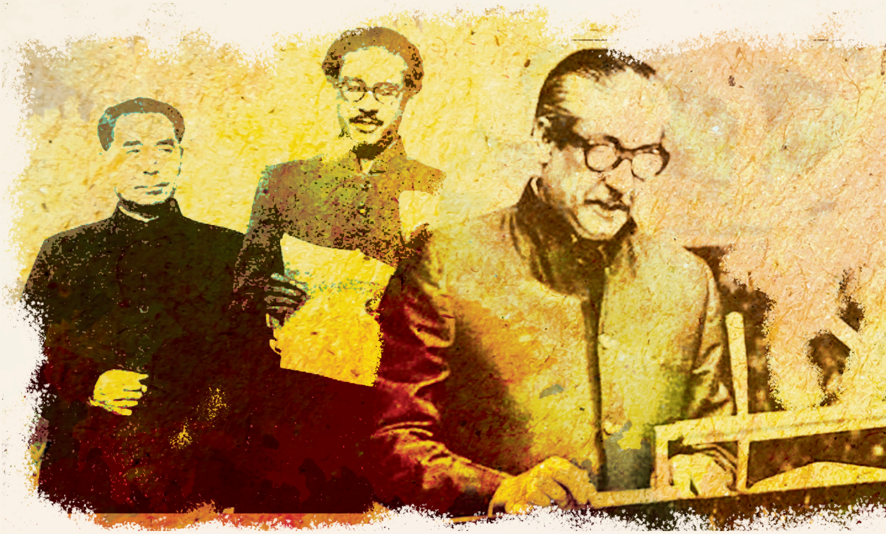

বঙ্গবন্ধুর বিশ্বযাত্রা

সেলিনা হোসেন

উদযাপিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বাঙালি, বাঙালিত্বের নির্যাস যুক্ত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অমোঘ উচ্চারণ 'ফাঁসির মঞ্চেও যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা 'জয় বাংলা' এই উচ্চারণের সঙ্গে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে উজ্জীবিত করে বাঙালিত্বের গৌরবকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সময়ে তাঁর মৃত্যু বিশ্বজোড়া বাঙালির সামনে শুধুমাত্র শোকের দিন নয়। গৌরব এবং মর্যাদার জায়গা থেকে তিনি বাঙালির সামনে মৃত্যুহীন মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যাগাজিন নিউজ উইকের প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি অসাধারণ উক্তি। তাঁকে poet of politics অভিধায় চিহ্নিত করা হয়েছিল। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে মুক্তিকামী মানুষের অসাধারণ যোদ্ধা হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছিলেন।

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-নিরলস এক রাষ্ট্রনায়ক' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'আমার সৌভাগ্য যে, ১৯৭১ সালের ১৫ই জুন রাজ্যসভায় আমি প্রস্তাব করেছিলাম মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশের সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়ার। আমার বক্তব্য এখনও পড়া যাবে রাজ্যসভার কার্যবিবরণী থেকে। যখন এক সদস্য আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আমি বলেছিলাম : "আমার প্রস্তাব রাজনৈতিক সমাধানের। যার পূর্বশর্ত বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সরকারকে সকল ধরনের সহায়তা করা।" আমি সভাকে মনে করিয়ে দিই যে, এই ধরনের স্বীকৃতির অনেক উদাহরণ আছে বিশ্বের ইতিহাসে। .... গর্বিত বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কী কী করা দরকার তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভালোভাবেই জানতেন। তিনি কোনো সময় নষ্ট না করে সেই স্বপ্নপূরণের নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

ব্রিটিশ এনজিও অক্সফামের সাবেক কর্মকর্তা জুলিয়ান ফ্রান্সিস 'মননে স্মরণে বঙ্গবন্ধু' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন : '১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমি অক্সফামের হয়ে দিল্লিতে কাজ করছিলাম। আমার মনে আছে, ওইদিন পরিবার নিয়ে টিভিতে আমরা ভারতের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উপভোগ করছিলাম। হঠাৎই টিভিতে এক জরুরি খবরে বলা হয় শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করা

হয়েছে। আমার মনে আছে খবরটি শুনেই আমি শোকে কাতর হয়ে পড়ি, কান্নায় ভেঙে পড়ি। প্রায় ৪৫ বছর পর আজও সেই দিনটি মনে পড়লে আমি অজান্তেই আবেগপ্রবণ হয়ে যাই।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ 'বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ। এই স্বীকৃতি ইতিহাসের বড় সময় ধরে বিশ্বজুড়ে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ তৈরি করেছে বলতেই হবে। ইউনেস্কোর মাধ্যমে বাঙালির অর্জন বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্য মানবজাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়। অনুপ্রেরণা প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে মানুষের মানবিক অধিকারকে নিশ্চিত করে।

চল্লিশের দশকে প্রখ্যাত লেখক এস ওয়াজেদ আলি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, 'এখন বাঙালি কেবল ভারতবর্ষের নয়, কেবল প্রাচ্য ভূখণ্ডের নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শক হবে- সত্য, সুন্দর, শুভ জীবন-পথের।' চল্লিশের দশক থেকে ষাটের দশক-মাত্র দু-দশক সময়ের ব্যবধানে এমন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা শুরু করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি বিশ্ববাসীর পথ প্রদর্শকের জায়গায় স্থান দিয়েছে। এই অবদান বঙ্গবন্ধুর বিশ্বযাত্রা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর 'ভাইয়েরা আমার' প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন : 'যে ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গনে এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রেরণা ছিল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বজ্রকণ্ঠের এ ভাষণ মানুষের মাঝে শক্তি জুগিয়েছিল, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা দিয়েছিল, সে ভাষণ ছিল নিষিদ্ধ।

১৯৭৫ সালের পর ২১ বছর সময় লেগেছে এ ভাষণ জনগণের সামনে সরকারিভাবে প্রচার করার জন্য। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর সরকারি গণমাধ্যমে এই ভাষণ প্রচার শুরু হয়।

আজ এ ভাষণ ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড "ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার"-এ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বি এন আহুজা সম্পাদিত দ্য ওয়ার্ল্ডস গ্রেট স্পিচেস শীর্ষক রেফারেন্স বইয়ে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ও ইতিহাসবিদ জেকব এফ ফিল্ড-এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস : দ্য স্পিচেস দ্যাট ইনস্পায়ার্ড

হিস্ট্রি গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ।

বিশ্বের বিখ্যাত যত ভাষণ বিশ্বনেতারা দিয়েছেন, সবই ছিল লিখিত, পূর্ব প্রস্তুতকৃত ভাষণ। আর ৭ই মার্চের ভাষণটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, উপস্থিত বক্তৃতা। এই ভাষণ ছিল একজন নেতার দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা। একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি। যে-যুদ্ধ এনে দিয়েছে বিজয়। বিজয়ের রূপরেখা ছিল এ বক্তৃতায়- যা সাত কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ছিল ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা।

১৯৭৪ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাঙালির আত্মমর্যাদার জায়গা খুলে দিয়েছিলেন বিশ্বের সামনে। জাতিসংঘের সরকারি ভাষা ছয়টি। ইংরেজি, ফরাসী, রুশ, চীনা, স্প্যানিশ ও আরবী। এই কয়টি ভাষা আলোচনার সময় অনুবাদকরা অনুবাদ করে বলতে থাকেন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

নিউইয়র্কে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিৎ সাহা ২৫শে সেপ্টেম্বরকে বাংলাদেশী ইমিগ্রান্ট ডে হিসাবে পালন করার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবের আলোকে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটন স্টেভেস্কি এই দিনটিকে ‘বাংলাদেশ ইমিগ্রান্ট ডে’ হিসাবে রিজলিউশন পাশ করার জন্য সিনেটে উপস্থাপন করে। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। ২০২০ সালের ১৪ জানুয়ারি এই প্রস্তাব পাশ হয়।

রিজলিউশনের শেষ ধারাটি ছিল এমন : Resolved, That this Legislative Body pause in its deliberations to memorialize Governor Andrew M. Cuomo to proclaim September 25, 2020, as Bangladeshi Immigrant Day in the State of New York, and to recognize the many contributions of Bangladeshi-Americans to New York; and be it further Resolved, That copies of this Resolution, suitably engrossed, be transmitted to Andrew M. Cuomo, Governor of the State of New York; and Bishawjit Saha, CEO and Founder of the Muktadhara Foundation.

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চকে আন্তর্জাতিক বঙ্গবন্ধু দিবস হিসেবে গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর ছবি সম্বলিত স্মারক সিলমোহর প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ডাক বিভাগ ইউএসপিএস। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আবেদনে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ই মার্চ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস পোস্ট অফিসে এই

স্মারক ডাকচিহ্ন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন পোস্ট অফিসের সুপারভাইজার স্যালাজার ফাতিমা।

২০১৯ সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা বিশ্ববন্ধু হিসেবে অভিষিক্ত করেন। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট একটি দেশের একজন রাজনৈতিক নেতার এই অর্জন বাঙালি জাতির গৌরবময় অর্জন। বঙ্গবন্ধুর এই বিশ্বযাত্রা।

২০১৬ সালে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের আবেদনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পোস্ট অফিস স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করে। ২০২০ সালের ১০ মার্চ স্টেট সিনেটর জন ল্যুর প্রস্তাবনায় বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট বিশেষ রেজুলেশন পাশ করে।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভার্চুয়াল বইমেলার আয়োজন করে। ১৮ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এই মেলা চলবে।

স্মরণের বরণ মালায় বঙ্গবন্ধুকে সুশোভিত রাখা বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এ জায়গা থেকে বিযুক্ত থেকে আমরা যেন নিজেদের ক্ষুদ্র করে না ফেলি। বিশ্বের মানুষ যেভাবে বঙ্গবন্ধুকে মূল্যায়ণ করেছেন সে বিশ্বযাত্রা থেকে বঙ্গবন্ধুকে পিছুটানা জাতি হিসেবে আমাদের ব্যর্থতার পরিচায়ক। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে মানুষের বিভিন্ন দল করার অধিকার আছে। কিন্তু দেশের মর্যাদার প্রশ্নে সবাইকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধুর ছবি নামানো যাবে না। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ প্রচারের বিরোধিতা করা যাবে না। তাঁকে জাতির স্বাধীনতার স্মৃতি হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদায় রাখতে হবে।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছেন : ‘শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর আমাকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। তিনি একজন মহান নেতা ছিলেন। তাঁর অসামান্য বীরত্ব সম্পূর্ণ এশিয়া ও আফ্রিকার জন্য অনুপ্রেরণার উৎস।’ ‘আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতা উনি হিমালয়তুল্য।’

প্যালেস্টাইনের সাবেক রাষ্ট্রপতি ইয়াসির আরাফাত বলেছেন : ‘মুজিবের বিশিষ্টতা ছিল তার অদম্য লড়াকু নেতৃত্ব ও উদার মন।’ বিশ্বের অনেক নেতা বঙ্গবন্ধুর গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যায়ন করেছেন।

কবি কামাল চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ 'বঙ্গবন্ধু : চিরন্তর আলোকশিখা' প্রবন্ধে বলেছেন : 'জীবনকালে বঙ্গবন্ধু বাঙালির মহানায়ক ও বিশ্বনেতা হিসেবে পরমভাবে আদৃত ছিলেন। বিশ্ব মিডিয়ায় তিনি ছিলেন রাজনীতির কবি ও সিংহহৃদয় নেতা। তাঁকে তুলনা করা হয়েছে সাইমন বলিভার আর জর্জ ওয়াশিংটন প্রমুখের সঙ্গে, বিসুভিয়াস ও হিমালয়ের সঙ্গে; পদ্মা-মেঘনা, যমুনার জলপ্রবাহের সঙ্গে। মৃত্যুতে তাঁকে তুলনা করা হয়েছে আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের সঙ্গে। মাত্র ৫৫ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে তিনি জনমানসে রূপকথার মহানায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। মৃত্যুতে পরিণত হয়েছেন চিরকালীন শোকের প্রতীকে। বস্তুত, পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি যুগপৎ বিজয়ী বীর ও ট্র্যাজেডির মহানায়ক।'

বিশ্বজুড়ে যাঁকে এত গভীর শ্রদ্ধায় মূল্যায়ন করা হয় তাঁকে নিয়ে কোনো রাজনৈতিক দল ছিনিমিনি খেলবে না। এই প্রত্যাশা দেশবাসী। ক্ষমতায় যে রাজনৈতিক দল থাকুক বঙ্গবন্ধুকে মর্যাদার আসনে রেখে নিজেদের আত্মসম্মান ঠিক রাখবেন এটাই প্রত্যাশা।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করি তাঁর একশতম জন্মবার্ষিকী।

বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তা

সেলিনা হোসেন

বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তার পূর্ণমাত্রার অনুষঙ্গ তাঁর রচিত বইয়ে ফুটে উঠেছে। রচনার শিল্প-সুষমা পাঠকের বোধের চেতনা পরিশীলিত করে। তিনটি বই তিন ধরনেরর আঙ্গিকে লেখা হয়েছে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' আত্মজীবনীমূলক রচনা, 'কারাগারের রোজনামচা' ডায়েরির আঙ্গিকে লেখা, 'আমার দেখা নয়াচীন' শুধুই ভ্রমণ কাহিনী নয়। বিশ্লেষণের মাত্রায় একটি ভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক পরিসর দারুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। পাঠক শুধুই ভ্রমণকাহিনী হিসেবে পড়ে শেষ করতে পারবে না। একটি দেশকে নানা মাত্রায় জানার ধারণা পাবে।

সৃজনশীল চিন্তার জগৎ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জগৎটি যেমন অনায়াসে বুঝতেন, তেমনি তাঁর প্রকাশও বক্তৃতায় এবং লেখায় সহজভাবে করতে পারতেন। তাঁর রচিত তিনটি বই আমাদের সামনে এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দী হিসেবে কারাগারে থাকার সময় বই তিনটি

রচনা করেন। তিনটি বই সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ। সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় তিনটি বইয়ে। এখানে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে শেখ মুজিবের চিন্তার মগ্নতা গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে, অন্যদিকে নিজের রাজনৈতিক জীবন তখনকার সময়ের পটভূমিতে চমৎকারভাবে তিনি উঠিয়ে এনেছেন। পাশাপাশি চোখ রেখেছেন জগতের নানা দিকে। খুঁটিনাটি নানা বৃত্তান্ত এবং নিজের অনুভবের সারাৎসারে তাঁর প্রতিটি বই হয়ে উঠেছে অনন্য। এই বইগুলোতে কেবল একজন রাজনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, লেখকের দায়বোধও ফুটে উঠেছে। ফলে বলা যায়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শিল্পের সুষমা – এটিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বইয়ের বহুমাত্রিক ব্যাঞ্জনা।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম বই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। এটি লেখা হয়েছে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন তিনি কারারুদ্ধ। আত্মজীবনীর শুরু হয়েছে তাঁর জন্মের সময় থেকে; পাশাপাশি এসেছে পিতৃপুরুষের কথাও। আর বইটি শেষ হয়েছে ১৯৫৫ সালের ঘটনাবলী দিয়ে। আত্মজীবনীটি বঙ্গবন্ধু শেষ করতে পারেননি। কিন্তু সরল প্রাঞ্জল ভাষায় নির্মোহভাবে ঘটনাবলির বর্ণনা থাকার কারণে, সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ থাকার কারণে পাঠক তরতর করে এগিয়ে যেতে পারে। মনে হয় না যে শেষ হয়ে হইল না শেষ।

জীবনী লেখার পটভূমি তিনি উল্লেখ করেছেন বইয়ের ভূমিকায়, ‘বন্ধুবান্ধবরা

বলে, "তোমার জীবনী লেখ।" সহকর্মীরা বলে, "রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।" আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, "বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।" বললাম, লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি, যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।' পাশাপাশি তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উল্লেখ করেছেন চমৎকার একটি পঙ্‌ক্তিতে। যেমন 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা।' এই বাক্যে বিমূর্ত হয়ে ওঠে লেখকের চিন্তার পরিসর। একদিকে আছে ছোট ঘরের কথা, অন্যদিকে আছে আকাশ। ঘর এবং আকাশের সমান্তরালে তিনি তুলে ধরেন একজন রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। রাজনীতির দর্শন এখানে বিমূর্ত। রাজনীতি শুরু হবে মাটি থেকে, উচ্চতায় পৌঁছাবে আকাশ পর্যন্ত। এমনই আসাধারণ বাক্য এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তা। সৃজনশীলতার মাত্রায় বাক্য গঠন করে দার্শনিক অনুভবে তা পৌঁছে দেন পাঠকের মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে। অনুভবের দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয় এমন বাক্যে। একজন রাজনৈতিক নেতাকে তিনি যেভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করেছেন তা কবিতার পংক্তি হয়ে পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।

বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায় প্রকৃতির বর্ণনা আছে। তাঁর টুঙ্গিপাড়ার শৈশব-কৈশোরের জীবন এই প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে। বোধ করি এ কারণেই প্রকৃতির বর্ণনা তাঁর রচনার একটি বড় দিক। এই বর্ণনা তাঁর লেখা তিনটি বইয়েই পাওয়া যায়। চীনে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে তিনি হ্যাংচো শহরে বেড়ানোর বর্ণনা করেছেন এভাবে : 'সাংহাই থেকে আমরা হ্যাংচোতে আসলাম। হ্যাংচো পশ্চিম হ্রদের পাড়ে। একে চীনের কাশ্মীর বলা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফলে ফুলে ভরা এই দেশটা। লেকের চারপাশে শহর। আমাদের নতুন হোটেলে রাখা হয়েছে, লেকের পাড়ে। ছোট ছোট নৌকায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চীন দেশের লোকেরা। তারা এখানে আসে বিশ্রাম করতে। লেকের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে দ্বীপ আছে। হ্যাংচো ও ক্যান্টন দেখলে মনে হবে যেন পূর্ব বাংলা। সবুজের মেলা চারিদিকে। পীর সাহেব একদিন শুধু প্যাগোডা দেখলেন, পরের দিনও যাবেন অতি পুরাতন প্যাগোডাগুলি দেখতে। আমি ও ইলিয়াস কেটে পড়লাম। নৌকায় চড়ে লেকের চারিদিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। দ্বীপগুলির ভিতরে সুন্দরভাবে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েরা এখানে নৌকা চালায়। নৌকা ছাড়া বর্ষাকালে এখানে চলাফেরার উপায় নাই। বড়, ছোট সকল অবস্থার লোকেরই

নিজস্ব নৌকা আছে। আমি নৌকা বাইতে জানি, পানির দেশের মানুষ। আমি লেকে নৌকা বাইতে শুরু করলাম।'

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' জুড়েই আছে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যত দিন দুনিয়ায় থাকবে, তত দিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।' এখানে নিজের জীবনদর্শনের এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, যা একজন ব্যক্তিকে বোঝা সহজ করে দেয়। তরুণ বয়স থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ ছিলেন। তাঁর একটি অসাধারণ উদ্ধৃতি এমন : '১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন। আগেই বলেছি আমার বয়স একটু বেশি, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়ল আমার উপর। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে। এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধূলা, বেড়ান– সবই চলত।' এই উদ্ধৃতি থেকে পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে বক্তৃতা করতেন। সংবিধানের চারটি মৌলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ। জীবন দর্শনের মৌল চেতনায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন দীপ্ত মানুষ।

ফরিদপুর জেলখানায় দেখা হওয়া চন্দ্রবাবুকে তিনি পরম মমতায় তুলে এনেছেন তাঁর লেখায় : 'চন্দ্র ঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হল, আর বাঁচবেন না, আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, "ভাই, এরা আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে বদনাম দিল; শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়!

কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বোলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখ। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকেই শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।" এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার, ডাক্তার ও গোয়েন্দা কর্মচারী সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। আর আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, "চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।" আর কথা বলার শক্তি আমার ছিল না।" এমন মানবিক চেতনায় তিনি ঋদ্ধ ছিলেন। এজন্য গণমানুষের পক্ষে তাঁর দৃঢ়তা কোনো পরিস্থিতিতেই হ্রাস পায়নি। মানবিক মর্যাদায় তিনি মানুষের অধিকারকে সমুন্নত রেখেছেন।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত লেখা। পুরো বই জুড়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে নিজের চিন্তার সঙ্গে সমসাময়িক ঘটনা তুলে এনেছেন। বিরতিহীনভাবে টানা লেখায় কোথাও ছন্দপতন হয় না। পাঠক জানার আগ্রহে ইচ্ছুক থাকেন। তথ্য এবং ব্যক্তির চিন্তার স্বচ্ছতা যোগ হয়ে এই বই পাঠকের সামনে ব্যতিক্রমী মাত্রা। আত্মজীবনীর পুরোটুকু নেই। কিন্তু ৩৫ বছরের জীবনের বহুমাত্রিক দিক আছে। এ কারণে পাঠকপ্রিয়তা এই বইয়ের ভিন্ন ভুবন। এভাবে বাঙালির মানসচেতনায় সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে এই বই।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বই 'কারাগারের রোজনামচা' প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ সালে। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন শেখ রেহানা। এই বইও বঙ্গবন্ধু কারাগারে বসে রচনা করেন। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র মতো এটিও নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিন্নধর্মী এই বইটিও তাঁর লেখক সত্তায় পরিস্ফুটিত হয়েছে। জেলখানার নানা তথ্য এ বই থেকে সংগ্রহ করে পাঠকের জেলখানা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ হবে। স্লোগানের মতো দুটি ছোট ছোট বাক্য পাওয়া যায়। যেমন : 'জেলের ভেতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে' – আর একটি হলো : 'থালা বাটি কম্বল/ জেলখানার সম্বল।'

বইটি তারিখ অনুযায়ী সূচনা হয়েছে – '২রা জুন ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার।' এর আগে তিনি বেশ বড় একটি অংশ ভূমিকার মতো লিখেছেন। শুরুটা এমন : 'জেলে যারা যায় নাই, জেল যারা খাটে নাই–তারা জানে না জেল কি জিনিস।

বাইরে থেকে মানুষের যে ধারণা জেল সম্বন্ধে ভিতরে তার একদম উল্টা। জনসাধারণ মনে করে চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, ভিতরে সমস্ত কয়েদি এক সাথে থাকে, তাহা নয়। জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে।

কারাগার যার একটা আলাদা দুনিয়া। এখানে আইনের বইতে যত রকম শাস্তি আছে সকল রকম শাস্তিপ্রাপ্ত লোকই পাওয়া যায়। খুনি, ডাকাত, চোর, বদমায়েশ, পাগল- নানারকম লোক এক জায়গায় থাকে। রাজবন্দিও আছে। আর আছে হাজতি–যাদের বিচার হয় নাই বা হতেছে, এখনও জামিন পায় নাই। এই বিচিত্র দুনিয়ায় গেলে মানুষ বুঝতে পারে কত রকম লোক দুনিয়ায় আছে। বেশি দিন না থাকলে বোঝা যায় না। তিন রকম জেল আছে। কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা জেল, আর সাবজেল- যেগুলি মহকুমায় আছে। জেলখানায় মানুষ, মানুষ থাকে না- মেশিন হয়ে যায়। অনেক দোষী লোক আছে; আর অনেক নির্দোষ লোকও সাজা পেয়ে আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। সাবজেল দুইতিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত লোক ছাড়া রাখে না। ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় তিন বছরের উপর জেল হলে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাইয়া দেয়।'

এই অংশে তিনি জেলখানার বিভিন্ন দফার বর্ণনা করেছেন। দফাগুলো এমন : ১. রাইটার দফা, ২. চৌকি দফা, ৩. জলভরি দফা, ৪. ঝাড়ু দফা, ৫. বন্দুক দফা, ৬. পাগল দফা, ৭. আইন দফা, ৮. হাজতি দফা, ৯. ছোকরা দফা।

এই অংশে লুদু নামের একজন কয়েদীর কথা আছে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার কয়েকবার জেলে দেখা হয়। ১৯৫০ সালে প্রথমবার। সে পকেট মারতো। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বারবার জেলে এসেছে। বঙ্গবন্ধু ওর প্রসঙ্গ শেষ করেছেন এই বাক্যটি দিয়ে "লুদু জেলের বাহির হয়ে কি করবে জানি না, তবে কথায় বার্তায় মনে হয় ওর জীবনের উপর একটা ধিক্কার এসেছে।" এখানেই তাঁর রচনার শিল্প-সুষমা উঠে আসে।

তিনটে বইয়েই তাঁর গদ্যে কখনো সাধু ও চলিত শব্দের মিশ্রণ আছে। যেমন : 'মাঝে মাঝে বৃষ্টি হতেছে। ঘরেই থাকতে হবে।' প্রমিত বাংলা হলে তিনি লিখতেন 'হচ্ছে'। আর একটি বাক্য এমন : 'সে বলে কিছুই জানি না। এর বেশি কিছু গোছাইয়া বলতে পারে না।' চলিত ভাষা হলে লিখতেন 'গুছিয়ে'। আর একটি বাক্য : 'নিজেই মুরগি পাক করে পাঠাইয়া দিলাম। আমি না খেয়ে জমাইয়া ছিলাম।' এখানে পাঠাইয়া হবে 'পাঠিয়ে, আর 'জমাইয়া' হবে 'জমিয়ে'। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর গদ্যের টান এত প্রবল যে এমন বিন্দু বিন্দু শব্দের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে দাগ কাটে না। পাঠক একটানে পড়ে ফেলে। এখানেই বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তার বৈশিষ্ট্য।

এই বইও বঙ্গবন্ধু লিখেছেন স্বচ্ছ-স্বচ্ছন্দ ভাষায়। এখানেও চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ, 'আমার ঘরের কাছের আম গাছটিতে রোজ ১০টা-১১টার সময় দুইটা হলদে পাখি আসে। ওদের খেলা আমি দেখি। ওদের আমি ভালবেসে ফেলেছি বলে মনে হয়। ১৯৫৮ সালে দুইটা হলদে পাখি আসত। তাদের চেহারা আজও আমার মনে আছে। সেই দুইটা পাখির পরিবর্তে আর দুইটা পাখি আসে। পূর্বের দুইটার চেয়ে একটু ছোট মনে হয়।'

আম গাছে কাকের উৎপাত প্রসঙ্গেও বর্ণনা আছে। কাকেদের চিৎকারে তিনি খুব বিরক্ত হতেন। বাগানি কাদের মিয়াকে তিনি কাকেদের বাসা ভেঙে দিতে বলেন। বাসা ভাঙার পর কাকেরা জড়ো হয়ে একসঙ্গে চিৎকার করত।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'কিছু সঙ্গী জোগাড় করে ওরা কাদেরকে গাছে আক্রমণ করত। দুই-একদিন শত শত কাক যোগাড় করে প্রতিবাদ করত। ওদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে আমি মনে মনে প্রশংসা করলাম। বাঙালিদের চেয়ে ওদের একতা বেশি।' এভাবে কারাবাসে দিন কাটানোর সময়গুলোতে তিনি দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন বিচিত্র কিছু। সেসব সরসভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর লেখায় কৌতুকও পাওয়া যায়। কাকেদের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'কিছুদিন পর্যন্ত কাকরা আমাকে দেখলেই চিৎকার করে প্রতিবাদ করত, ভাবত আমি বুঝি ওদের ঘর ভাঙব। এখন আর আমাকে দেখলে ওরা চিৎকার করে প্রতিবাদ করে না, আর নিন্দা প্রস্তাবও পাশ করে না।' এ জায়গাটা পড়ে হাসি চেপে রাখা যায় না। এমন রসিকতাও তাঁর কলমে উঠে এসেছে।

বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের জীবনও উপলব্ধি করেছেন জেলখানায় বসে। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করি, 'কে বুঝবে আমাদের মতো রাজনৈতিক বন্দীদের বুকের ব্যথা। আমার ছেলেমেয়েদের তো থাকা খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না। এমন অনেক লোক আছে যাদের স্ত্রীদের ভিক্ষা করে, পরের বাড়ি খেটে, এমনকি ইজ্জত দিয়েও সংসার চালাতে হয়েছে। জীবনে অনেক রাজবন্দীর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের চিঠি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। সে করুণ কাহিনী কল্পনা করতেও ভয় হয়।' পুরো বইয়ের অনেক জায়গায় এমন অনেক মন্তব্য আছে, যেটা পড়লে রাজনীতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে দার্শনিক যোগ, সেগুলো বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ পায়।

আসলে তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল মননশীলতায় পূর্ণ। তাঁর রচিত গ্রন্থ এভাবেই পূর্ণ হয় জাগতিক ভুবনের সৃজনশীলতার যাত্রা থেকে। এটা অবশ্যই রচনাকারের সিদ্ধি।

বঙ্গবন্ধু রচিত এই দুই বই সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু-গবেষক ড. আতিউর রহমান তাঁর

অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে : '১৯৬৬ সালে জেলে নেওয়ার পর দীর্ঘ দিন আর তিনি মুক্তি পাননি। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে তাঁকে বন্দী দেখানো হয়। সেই বন্দীশালা ভেঙেই জনগণ তাঁকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময়ের বন্দী জীবনের কথা কারাগারের রোজনামচায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সকল বিচারে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের অনবদ্য দুই দলিল।'

তাঁর তৃতীয় বই 'আমার দেখা নয়াচীন'। প্রকাশিত হয় ২০২০ সালে। এটিও কারাগারে রাজবন্দী থাকার সময়ে রচিত। বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। সে সময় নয়াচীন দেখার অভিজ্ঞতার আলোকে বইটি রচিত। তবে এখানে তিনি শুধু ভ্রমণ বৃত্তান্তই তুলে ধরেননি, নয়া চীনের সমাজ-দর্শনও এসেছে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকদর্শন ও মূল্যায়নমূলক পর্যালোচনাও সমৃদ্ধ করেছে বইটিকে।

এতে মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন বঙ্গবন্ধু, 'চীনে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, অনেকেই ইংরেজি জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবেন না। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। আমরা নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজি জানেন, কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন চীনা ভাষায়। দোভাষী আমাদের বুঝাইয়া দিল। দেখলাম তিনি মাঝে মাঝে এবং আস্তে তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন, যেখানে ইংরেজি ভুল হচ্ছে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপর দরদ।'

বঙ্গবন্ধু এই বইয়ে নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ে নিজের দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এতে বোঝা যায় শুধু ভ্রমন নয়, রাষ্ট্র ব্যবস্থার নানাদিক তুলে ধরে সেখান থেকে উত্তরণের পথ দেখতে পেয়েছেন। মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ এমন : "আমি আমার দোভাষীর মাধ্যমে সাংহাই শান্তি কমিটির নেতার সাথে আলাপ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা বেশ্যাবৃত্তি কী করে তুলে দিলেন? তারা বললো : আইন করে তুলে দেন নাই। তবে কি অত্যাচার করে তুলে দিয়েছেন?" উত্তরে বললেন, "না, অত্যাচার করেও তুলে দেই নাই। আবার আইন করেও তুলে দেই নাই। আইন করে তুলে দিলে কি হবে, এদের তো বাঁচাতে হবে। এদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই তারপর আইন করা যায়। শুধু আইন করলেই কোনো কাজ হয় না। আমাদের সরকার প্রথম গণনা করলো কত বেশ্যা চীনদেশে

আছে। তারপর তাদের জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা করা হলো। আমরা প্রত্যেক সমাজসেবক প্রথমে তাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে লাগলাম, তোমরা এ বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও। তোমাদের কাজের বন্দোবস্ত করে দিতেছি। তোমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবা অন্য মেয়েরা যেভাবে করে, তারপর যাকে পছন্দ করবা তার যদি মত হয়, তবে তোমাদের বিবাহ হবে, সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে। তোমরা সাধারণ মানুষের মতো বাস করতে পারবা।"

অন্যদিকে দুর্নীতি দমনের জায়গাটিও এই বইয়ে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু – 'এক জায়গায় এক ঘটনা শুনলাম, এক সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়েছিল, তাকে জনসাধারণ ধরাইয়া দেয়। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। সেই হতে কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেউই ঘুষ খেতে সাহস পায় না।'

এমন অসংখ্য দিক আছে এই বইয়ে যেখানে তিনি আলোচনায় নিজের দেশের বাস্তব অবস্থাটিও তুলে ধরেছেন। চীন দেশে এসব অবস্থার কিভাবে সমাধান হয়েছেন সেটাও দেখিয়েছে। একসময় হোয়াৎ নদীকে বলা হতো চীনের দুঃখ। সেই নদীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে তারও ব্যাখ্যা আছে। একইসঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন : 'বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছেন।' দেশের সার্বিক কল্যাণে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি হত গভীরভাবে প্রয়োজন এই একটি বঙ্গবন্ধু চীনে অসাধারণ দিক।

বঙ্গবন্ধু চীনে শান্তি সম্মেলনে গিয়ে কত গভীরভাবে নানাদিকের ব্যাখ্যা করেছেন তা তাঁর লেখক সত্তার মৌলিক সত্য।

'আমার দেখা নয়াচীন'-এর শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করার মতো, 'নয়াচীনের উন্নতি দেখে সত্যিই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি দশ বৎসর তারা দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়তে পারে তবে দেশের জনসাধারণের কোনো দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না, অশিক্ষা-কুসংস্কার মুছে যাবে। এবং দুনিয়ার যেকোনো শক্তির সাথে তারা মোকাবেলা করতে পারবে সকল দিক থেকে, কারণ জাতিকে গড়ে তোলার যে প্রধান শক্তি জনসাধারণের মনোবল, তা নয়াচীনের জনগণের মধ্যে আছে।' তিনটি বইয়েই পাঠক দেখতে পান তিনি শুধু লেখার জন্য লেখেননি। লেখক সত্তা বিস্তৃত করেছেন নানা আয়োজনে। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ভিন্নধর্মী মাত্রায় বইগুলো পাঠকের মননশীল চেতনাকে ঋদ্ধ করে।

এমন আরও অনেক উদাহরণ আছে, যাঁরা বইটি পড়বেন, তাঁরা দেখবেন বঙ্গবন্ধু

এখানে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে নয়াচীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেই তাঁর এ বই হয়ে উঠেছে দার্শনিক বোধে প্রদীপ্ত।

প্রাবন্ধিক-গবেষক শামসুজ্জামান খান তাঁর এই বই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'প্রথমেই তিনি পরিষ্কার করে নিয়েছেন, নিছক ভ্রমণ বা আনন্দ সফরে তিনি নয়াচীন শান্তি সম্মেলনে যান নি। স্বাদেশিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ শেখ মুজিব চীনা জনগণ বিপ্লবোত্তর দেশ গঠনে উৎসাহ-উদ্দীপনা, শ্রম-নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের চেতনায় কীভাবে সেখানে দ্রুত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটছে তার স্বরূপ অনুসন্ধানে গেছেন এটাই নয়াচীন আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে যোগদানে তাঁর প্রথম লক্ষ্য।'

উল্লিখিত তিন বইয়ে যে সহজ ভাষাভঙ্গি, বিভিন্ন ঘটনাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও লেখার মধ্যে সরস প্রবাহ-এই সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য রচনাশৈলীর প্রধান দিক, যা লেখক হিসেবে তাঁর সার্থকতাকেই প্রকাশ করে।

তথ্যসূত্র :

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী
পৃষ্ঠা- ১১, পৃষ্ঠা-১৯১, পৃষ্ঠা-২৩৩, পৃষ্ঠা-২৩৪

২. কারাগারের রোজনামচা
পৃষ্ঠা-৯০, পৃষ্ঠা-৯৭, পৃষ্ঠা-১১৮

৩. আমার দেখা নয়াচীন
পৃষ্ঠা-৪৪, পৃষ্ঠা-৯৮, পৃষ্ঠা-১১৮

৪. শেখ মুজিব- বাংলাদেশের আরেক নাম – আতিউর রহমান
আলোঘর প্রকাশনা, ই/৭, বর্ধিত পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা

৫. বঙ্গবন্ধুর নতুন বই আমার দেখা নয়াচীন – শামসুজ্জামান খান
বই, জানুয়ারি- জুন ২০২০ সংখ্যা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা